ইন্দিরা স্মরণে

পশ্চিমবঙ্গ

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

MISHA
তিন বছরের গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য আমাদের অনুমোদিত
এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
আমাদের চিলড্রেনস কাউন্টারে ছোট্ট বন্ধুদের
সাদর আমন্ত্রণ
সোভিয়েত বুকস এ্যান্ড পিরিওডিক্যালস্ শোরুম
৭৫সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১৬
ফোন : ২৯-৩০৬৫ ও ২৯-৯৮৮৩
মিশা এখন
সোভিয়েত
কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত মাসিক পক্ষিরাজ এর বার্ষিক গ্রাহক হলেই যে কোন একটা বই বিনামূল্যে উপহার পাবে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'ঘনাদা'র কথা জানেনা এমন বাঙালী ঠিক খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু কি ঘনাদার সব কীর্তি কাহিনী জানে? নিশ্চয়ই না। ঘনাদা কি জানেন না? কোথায় যাননি? বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের ভাঙা ঘরে তার ডেরা হলেও পৃথিবীর কোনো জিনিসই বোধহয় তার অজ্ঞাত নেই। অজ্ঞাত তিনিই—শিবু গৌর শশিরদের কাছে, আমাদের কাছে। ঘনাদার তল খুঁজে পাওয়া ভার। হোক ঘনাদার সম্বন্ধে বেশি কিছু জার ধৃষ্টতা আমাদের নেই, কেননা আমার কাছে মামার গল্পের সামিল ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্ ঘনাদার সিরিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই। যে বই না পড়লে ঘনাদার সবচেয়ে মজার এবং আসল আসল কীর্তিকলাপই অজানা রয়ে যাবে। রঙীন দুর্ধর্ষ প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী ধ্রুব রায়। পক্ষিরাজ প্রকাশনীর এইটি প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। দাম দশ টাকা।

নীলুর চোখের মণি তিতি। তিতি খুব ভালো জাতের পায়রা। মিষ্টি, সুন্দর ও ফুটফুটে সাদা পায়রা। একদিন একটা দুষ্টু লোক তিতিকে চুরি করে নিয়ে পালায়। তারপর তিতিকে নিয়ে কত কান্ড! সে সব কান্ড নিয়েই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন এক যে ছিল পায়রা। এতে যেমন আছে রহস্য তেমনি আছে রোমাঞ্চকর ঘটনা। যা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছোটদের জন্য এ যাবৎ যতগুলো উপন্যাস লিখেছেন এটি তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। রঙিন সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী মলয় সেন। দাম দশ টাকা। এটি পক্ষিরাজ প্রকাশনীর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ।

খুব শিগগিরই বেরুচ্ছে—

মহাশ্বেতা দেবীর

এক অসাধারণ রাজকাহিনী—

রাজা

পার্থসারথি মন্ডলের রঙিন ল্যামিনেটেড প্রচ্ছদে মোড়া! দাম আট টাকা।

পক্ষিরাজ প্রকাশনীর পরবর্তী বই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জাদুকর বসন্তনিবাস

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের

লঙ্ সাহেবের বাঘ

ধীরেন্দ্রলাল ধরের

লক্ষ্য সিংহাসন

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

?

পক্ষিরাজ প্রকাশনী

৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ঃ ৩৪-৩১৪৬

—ঃ নিয়মিত পক্ষিরাজ পাবার নিয়ম ঃ—

এক বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে কাছের কোন বই স্টলে অথবা হুইলার্স এর স্টলে খোঁজ করলেই 'পক্ষিরাজ' পাওয়া যায়। দাম প্রতি সংখ্যা দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা। শারদীয় সংখ্যার দাম আনুঃ কুড়ি টাকা।

দুই বৈশাখ ১৩৯১ থেকে ১২ মাসের গ্রাহক হলে ৪০ টাকা (বৃহদাকার পূজো সংখ্যা সহ)। সডাক ৪৫ টাকা। এছাড়া ১২ মাসের গ্রাহকরা নামী লেখকদের লেখা ১০টাকা দামের একটি গল্পের বই উপহার হিসাবে পাবে।

টাকা হাতে, মানি-অর্ডারে অথবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের উপর ড্রাফট পাঠাতে হবে ('PAKSHIRAJ')—এই নামে ড্রাফট হবে।

তিন নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ আছে। 'লেখা' এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে। তোমাদের পাতায় লেখা, আঁকার জন্য গ্রাহক নং ও 'বয়স' উল্লেখ করতে হবে। নইলে নির্বাচনে অসুবিধা হয়। লেখা মনোনীত হল কিনা জানানো এবং অমনোনীত লেখা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

চার ধাঁধা, ভেবে ভেবে সমাধান প্রভৃতির উত্তর এবং একাধিক প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পৃথক পৃথক কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। বিভাগীয় এবং যথাযথ প্রশ্ন ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ডাকে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাঁচ ইস্কুল কলেজ ক্লাব লাইব্রেরী বুক-স্টল যে কোন প্রতিষ্ঠান লিখলে নমুনা কপি পাঠানো হবে।

ছয় ৬ জনে এক সাথে গ্রাহক হলে ১ জনের গ্রাহক চাঁদা লাগবে না।

—ঃ যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ—
৩৮বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯
ফোন : ৩৪-৩১৪৬

—ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—
সাকসেস পাবলিশিং হাউস
১ বিধান সরণী
কলকাতা ৭৩

ইন্দিরা স্মরণে

পক্ষিরাজ

৭ম বর্ষ, ৮ম বিশেষ সংখ্যা / নভেম্বর ১৯৮৪

আমার ছেলেবেলা / ইন্দিরা গান্ধী ৯
আমার মা / ইন্দিরা গান্ধী ১১
ফেলে আসা দিন / ইন্দিরা গান্ধী ১৬
আমার প্রিয় / ইন্দিরা গান্ধী ২০
আমার প্রতিজ্ঞা / ইন্দিরা গান্ধী ২১
ইন্দিরা স্মরণে / প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬
ইন্দিরা গান্ধী / লীলা মজুমদার ৮
দুঃখকে ছাপিয়ে লজ্জাই বেশি / অতুল্য ঘোষ ১৪
চন্ডী লাহিড়ীর কার্টুন ২৩
ইন্দিরা গান্ধী ও বিজ্ঞান / অমিত চক্রবর্তী ২৪
স্মৃতিরেখা / পরিচয় গুপ্ত ৩২
একটি নামের নিশান / সরল দে ৭
ভুবনেশ্বরী / সুধীন্দ্র সরকার ১৮
স্মরণ / মুস্তাফা নাশাদ ১৯
পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয় ২৬
এক পলকে ইন্দিরা ২৯

নানা ইন্দিরা :

শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে ৭
মা ও মেয়ে ১২
পত্র প্রেরণা ১৩
শান্তিনিকেতনে ১৮
অরণ্যে ইন্দিরা ১৯
ইন্দিরার ঠিকুজি ২৮
পক্ষিরাজকে পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র ৩১
নানা ইন্দিরা ৩২
ভালোবাসতেন বাংলাভাষাকে ৩২

সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র
সহযোগী সম্পাদক : মনোহর করাতি

দাম : এক টাকা

অনিলকুমার করাতি কর্তৃক ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত ও
ফাইন প্রিন্টিং হাউস, ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা
নং ১৮৬ (১৬) টি. বি, সি./২এ-আই টি/৮৪ তারিখ ১৮/৯/৮৪

ইন্দিরা স্মরণে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইতিহাস স্তব্ধ করে দেবার মত একান্ত নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা আমাদেরই জীবনকালে যে ঘটল এ আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। ধর্মান্ধতায় উন্মত্ত আপন বিশ্বাসঘাতক দেহরক্ষীদের হাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিধন সেইমত ঘটনা।

এ অবিশ্বাস্য সংবাদ প্রথম শোনবার পর থেকে সমস্ত দেশের মানুষের মতই এমনই বিহ্বল মুহ্যমান হয়ে আছি যে ভালোকরে গুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতাই যেন পাচ্ছি না। ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত দেশের যে কি ছিলেন—রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর বিরোধীতা করে এসেছেন তাঁরাও আজ সে কথা গভীরভাবে বুঝতে পারছেন বলে মনে করি।

এই পক্ষিরাজের মত কাগজ যারা আপনার বলে মনে করে, সেই তোমাদের কাছে, সাধারণ রাজনীতির জগৎ অনেক দূরে হবারই কথা। উচিতও তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দিরা দেবী তাদের কত আপনার জন যে ছিলেন, বিশ্বাসঘাতক নিজের দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হয়ে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে যাওয়াতেই তা আমরা কিছুটা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি এই জন্যে তিনিত শুধু সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজনীতির জগতের মানুষ ছিলেন না—মায়ের কাছে সন্তানের মত ভারতবর্ষই তাঁর সর্বাকিছু নিয়ে তাঁর সারাক্ষণের ধ্যানজ্ঞান ছিল। স্বাধীন সুখী সমৃদ্ধ সকল দিক দিয়ে অগ্রসর ভারতবর্ষ কেমন করে জগৎসভায় তার যথাযোগ্য মর্যাদার আসন পাবে এই তপস্যাতেই নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। ভারত আত্মার সমস্ত মহিমা যাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল সেই মহিয়সীকে হারানোর বেদনা আমাদের যত গভীর, যে জীবন ব্রত তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন তা সম্পূর্ণ করার সংকল্প আর শপথ আমাদের ততই বজ্রকঠিন হওয়া উচিত নয় কি?

ভারতবর্ষের প্রাণ প্রতিমা ইন্দিরা গান্ধীর জীবন আর জীবন সাধনা সম্বন্ধে যা জানবার আছে তার অন্ত নেই। ছোট বড় দেশের সব মানুষকে সবিস্তারে তা জেনে আর

বারবার স্মরণ করে আত্মশুদ্ধি করতে হবে।

এখানে শুধু একটা কথাই বলি। একদিন বিশ্বের এক অসামান্যা অদ্বিতীয়া জন-গণ-মন-অধিনায়িকা হিসেবে যিনি বন্দিতা হবেন, বাল্যে কৈশোরে আর প্রথম যৌবনে তার সে রকম পরিণতির কোনো আভাস ছিল না বললেই হয়। মহৎ ও মধুর চরিত্রের সব রকম উপাদান নিয়েই তিনি রীতিমত লাজুক ও মুখচোরা একটি মেয়ে ছিলেন। এমন কি রাজনীতির রাজত্বের প্রতি আগ্রহ ছিল না বলেই বোধহয় স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে প্রথম দেশের মন্ত্রীসভার একজন হবার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে শুনেছি।

দেশের প্রয়োজনে সেই লাজুক মেয়েটিই কোন তপস্যায় সাক্ষাৎ বাক্‌দেবীর মত একদিন ভারত ও সেই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বে মানব কল্যাণের নির্দেশিকা অমৃত বাণীর দিব্য নির্ঝর হয়ে উঠলেন, সেই রহস্য-রূপান্তরের কথা আমাদের বিশেষ করে জানবার।

শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে

শীতের দুপুরে শ্রীপল্লীতে বাড়ির বাইরের ঘরে চেয়ার-টেবিলে বসে অন্ধ শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোমের মূর্তি তৈরি করছেন। হঠাৎ বাগানের গেট খুলে চটি-পরা পায়ের শব্দ বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। বিনোদবিহারীর শ্রবণ ছিল প্রবল প্রখর। কিছু রাগতস্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'কে এই অসময়ে এল? কে ওখানে?' কোনো উত্তর নেই। তখন প্রচন্ড চিৎকার করে বিনোদবিহারী জিগ্যেস করলেন, 'কে ওখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছ? এখন আমার সময় নেই, কেন এখন এসেছ? উত্তর দাও।' সেই চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এলেন বিনোদবিহারীর স্ত্রী লীলা। দরজায় নিশ্চল অতিথিকে দেখে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, 'ওমা, ইন্দু এসেছে। শোনো, ইন্দু তোমাকে দেখতে এসেছে।' বিনোদবিহারী কিঞ্চিৎ নরম হলেন, 'তা উত্তর দিচ্ছে না কেন ও?' 'তোমার গলা শুনে নিশ্চয় ভয় পেয়ে গিয়েছে। এসো ভিতরে এসো। আর কেউ সঙ্গে নেই? সচিব বা প্রহরী কেউ নেই। সকলকে এড়িয়ে নির্জন দুপুরে উত্তরায়ণ থেকে চুপিসাড়ে হেঁটে এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর একদা শিল্পশিক্ষক বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে।

একটি নামের নিশান

সরল দে

উত্তর থেকে দক্ষিণ আর
পশ্চিম থেকে পূর্বে—
একটি নামের নিশান উড়ছে,
চিরদিন জানি উড়বে।
কোটি কোটি বুকে ইন্দিরা বাঁচে;
হিংসা, তোমার কত 'গুলি' আছে?
যেদিকেই যাও, ইন্দিরা আজ,
কত 'গুলি' তুমি ছুঁড়বে?
এক জাতি এক প্রাণের স্বপ্ন
হয়নি তো গুলিবিদ্ধ,
হাতে হাত বাঁধে এই ভারতের
আবালবনিতা বৃদ্ধ।
এই দেশ আজ অবিচ্ছিন্ন,
ললাটে এঁকেছি মিলনচিহ্ন;
হিংসা, পালাও, উদ্দেশ্য যে
হয়নি তোমার সিদ্ধ।

ইন্দিরা গান্ধী

লীলা মজুমদার

আমরা সাধারণতঃ যে-সব মানবিক গুণকে পৌরুষ বলি, আসলে সে সব গুণই শ্রেষ্ঠ নারীদের মধ্যেও থাকতে বাধ্য। সাহস, সততা, সৎসাহস, ন্যায়বোধ, কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবার দূরদর্শিতা, স্বার্থত্যাগ, মায়া-মমতা। একমাত্র মাংসপেশীর বলিষ্ঠতা হয়তো পুরুষদের বেশি। সে-কালের কাজে শারীরিক বল ততটা গুরুত্ব পায় না। এমন কি পৃথিবীতে মানবসমাজ যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল, ঐতিহাসিকদের মতে তখন বেশির ভাগ জাতিই মাতৃপ্রধান ছিল।

ইন্দিরা গান্ধীও এই মায়ের জাতের প্রতিনিধি। তিনি চলে যাওয়াতে দেশটা মাতৃহারা হয়েছে। নিজে কৈশোরে মা-কে হারিয়ে ছিলেন। অন্য ছেলেমেয়েরা যেমন মা-বাবা ভাই-বোনের মাঝখানে একটা নিরাপদ স্নেহের নীড়ে মানুষ হয়, ইন্দিরা তেমন হননি। মা সুস্থ থাকতেও ওঁদের পারিবারিক জীবন কেটেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝোড়ো আবহাওয়ায়। জখম হওয়া, জেলে যাওয়া ছিল তাঁদের নিত্যকার ঘটনা।

অনেকদিন স্বদেশে বিদেশে চিকিৎসা সত্ত্বেও মা বাঁচেননি। ইন্দিরাও কখনো রুগ্ন মায়ের কাছে, কখনো দেশে বা ইংলণ্ডে, শান্তিনিকেতনে, কিম্বা অন্য প্রতিষ্ঠানে, কিম্বা কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। কোথাও বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি।

জেল থেকে বাবা ক্রমাগত চিঠি লিখে দেশপ্রেমের পাঠ দিতেন। দেশসেবক না হলে দেশনেতাও হওয়া যায় না, দেখতে দেখতে মেয়েও তা বুঝলেন। ক্রমে তাঁর মন ইস্পাতের মতো ধারালো আর খাঁটি হয়ে উঠেছিল। কেউ টের পায়নি। এমন কি এর অনেক বছর পরে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পরে যখন সর্ববাদী সম্মতিতে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন, অনেকের ভয় ছিল এমন কোমলা অনভিজ্ঞা মেয়ে একাজ করতে পারবে না। কাজের সময়ে মনের মধ্যেকার সেই ইস্পাতের পরিচয় পেয়ে সকলে স্তম্ভিত হয়েছিল।

তার চোখ থাকত সর্বদা দুঃখী আর দুর্বলদের দিকে। যখন বছর ২০ আগে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন যারা গান বাজনা অভিনয় ইত্যাদি করত এবং করাত আর সবচেয়ে কম টাকা আর সুবিধা পেত, একমাত্র তাঁর যত্নে তারাও একটু একটু করে অন্যদের সমান সুখ-সুবিধা পেয়েছিল। অনলস ভাবে কাজ করতেন ইন্দিরা। যেটাকে উচিত বলে বুঝতেন, সেটাকে কখনো ছাড়তেন না, বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হলেও না। ফলাফলের দায়িত্বও নিজেই বহন করতেন।

যে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতাদের পাশে দাঁড়াতে এবং সমানের মতো বিতর্কে যোগ দিতে পারতেন। কখনো এতটুকু অসৌজন্য করতে দেখা যেত না। একবার অনেকগুলি বিরোধী ভাবাপন্ন সাক্ষাৎকারী সাংবাদিক তাঁকে কোণঠাসা করেছিল। চারদিক থেকে তারা নানারকম অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সে সব শুনে রাগ হবার-ই কথা। ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু যারা চুপ করেছিল তাদের ডেকে ডেকে বলছিলেন, 'তুমি কিছু বলবে না?' শেষটা তাদের দম ফুরিয়ে গেল, তারা চুপ করল। তখন ইন্দিরা শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, তাতে কি কারো মুখে কথা নেই!

তোমরা অনেকেই তাঁকে দেখেছ। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর সাজসজ্জা। চৌকস, কিন্তু কোনো বাড়াবাড়ি বা দৃষ্টিকটু কিছু নেই। সবই খাঁটি ভারতীয়। ভারতীয় ফ্যাশান, ভারতীয় জিনিস।

ওঁকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন তাঁরা বলেন, ওঁদের জীবনযাত্রাই ছিল সাদাসিধে। খাওয়া-দাওয়া, আমোদ প্রমোদ সবই সরল। ওঁদের বাড়িতে কেউ মদ্যপান করে না। সিনেমা পর্যন্ত খুব ক্বচিৎ দেখে। গান-বাজনা, খেলা-ধুলো, শিল্প-সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এইসব ভালোবাসেন।

এই রকম মানুষ ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। চোখের সামনে এমন দেশকর্মীর দৃষ্টান্ত দেখলে, এবার তোমরা কি করবে?

" আমি দীর্ঘজীবন কখনোই চাই না। আজ যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত থাকবে। আমার সমস্ত জীবনটাকে নিয়োজিত করেছি দেশের স্বার্থে এখানকার সাধারণ মানুষের সেবায়। আমি এরজন্য গর্ব অনুভব করি।..."

ইন্দিরা

আমার ছেলেবেলা

ইন্দিরা গান্ধী

'তোমার মতো রাশভারি মেয়ে জীবনে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।' একথা বলতেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দিনের দেখা হওয়ার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। আমার বয়েস তখন মাস ছ'য়েক আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম ঠাকুমার কোলে চড়ে সিঁড়ির মাথায়।

মনে পড়ে, সেই অল্প বয়সের একদিনের স্মৃতি। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে তখন গোটা দেশে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হচ্ছে! আজও সেদিনের সেই উত্তেজনার স্মৃতি মনে পড়লে রোমাঞ্চ জাগে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রকাণ্ড চাতালে ডাঁইকরা দামি কাপড়ের রাশি। কী মনমাতানোই না ছিল সেইসবের রঙের বাহার। মখমল, সাটিন, রেশম আর শিফনের গাদায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লুকোচুরি খেলতে যে কী মজা, সে তো জানে কেবল বাচ্চারা।

সেদিন একটা নতুন জিনিস টের পেয়েছিলাম। মা-বাবার চেয়ে আমার জোর বেশি।

বিলিতি কাপড় পোড়ানোর উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে সবাই। কেবল বাদ দেওয়া হচ্ছে আমাকে। কারণ, আমি ছোট। খুবই ছোট। সেজন্যে আমাকে ধুম পাড়িয়ে রেখে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সেকথা ঠাকুর্দাকে জানাতে, ঠাকুর্দা আমার পক্ষে রায় দিলেন। কেবল

ছোট বয়সেই ইন্দিরা খুব কৌতূহল নিয়ে আলাপ আলোচনা শুনত। ওঁর পিসিমা কৃষ্ণা হাথিসিং বলেছেন, কোথায় কী ঘটছে সে বিষয়ে জানার গভীর আগ্রহ ছিল ইন্দিরার।

সেদিন না, পরেও, আমার পক্ষে থাকতেন তিনি বরাবর।

সেদিন জয় হয়েছিল আমার জেদের। কিন্তু খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই আমার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। মনে পড়ছে, সেদিন দেখেছিলাম, ডাঁইকরা কাপড়ের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একেকটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো। আর লকলকে জিভের মতো দাউ দাউ আগুনের শিখায় পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত কাপড়।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে, জীবনে প্রথমবার আমাকে দাঁড়াতে হল কর্তব্য আর বিবেকের মুখোমুখি। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। আপনমনে খেলাধুলো করতে ভালোবাসতাম, একা একা। তবে মা আমার কাছাকাছি থাকুন, আমি তাঁর গলা শুনতে পাব, তিনি চোখের আড়ালে যাবেন না,—এ আমি চাইতাম। সেই সময়ে, একদিন সন্ধ্যায় মা-কে দেখতে এলেন আমাদের এক আত্মীয়া; প্যারিস থেকে ফিরেছেন ক'দিন আগে। আমার জন্যে নিয়ে এসেছেন সেলাইয়ের কারুকাজ করা ভারি চমৎকার একটা জামা সেটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে মা বললেন 'এখন আমরা হাতে-কাটা সুতোর হাতেবোনা কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরি না।'

তখন চটের মতো খসখসে মোটা খদ্দরের কাপড়ই পাওয়া যেত। সেই শাড়ির ঘসা লেগে মা-র শরীরের কয়েক জায়গা ছড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠেছিল। সেটা লক্ষ্য করে আত্মীয়াটি রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন, 'তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সুস্থ শরীরটাকে ইচ্ছে করে ব্যস্ত করতে চাও, করো। এখন তোমরা বড় হয়েছ বলার কিছু নেই। তা এই বাচ্চাটাকে কষ্ট দেওয়া কেন? বিশেষ করে, আমি যখন এটা নিয়ে এসেছি ওকে দিতে।'

মা আমাকে কাছে ডাকলেন, 'এদিকে আয় ইন্দু। মাসি এই বিলিতি জামাটা এনেছে তোর জন্যে। দেখতে সুন্দর। তোর যদি মন চায়, তো এটা পর। তবে মনে আছে তো, সেই যে আমরা বিলিতি কাপড় আগুনে পুড়িয়েছিলাম, সেই কথাটা? আমরা কিন্তু খদ্দরই পরব। তোকে এই সৌখিন জামা গায়ে দিতে হবে একলা।'

আমার রীতিমতো লোভ হচ্ছিল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। ছোট্ট হাত দুটো আমি বাড়িয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ছোঁবার আগেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'না কক্ষনো পরব না। এটা নিয়ে যাও।'

আত্মীয়াটি আমাকে বোঝাতে লাগলেন, 'বাঃ পরবি না কেন। এমন চমৎকার জামা তোর ভালো লাগছে না?'

'লাগছে, খুবই ভালো লাগছে কিন্তু.....'

বড়দের মুখে-শোনা ধার-করা বুলি আউড়ে গেলাম। মাসিমা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, এ জামা তোকে পরতে হবে না সন্ন্যাসিনী ঠাকরুণ। তবে বল তো, তোর পুতুলটা বিলিতি কেন?"

খুব ভেবেচিন্তে যে তিনি কথাটা বলেছিলেন, তা নয়। হয়তো মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ছোটদের মনের কথা তো বড়রা বুঝতে পারে না। তাই তাদের হেলা-ফেলা করে। ছোটরা সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না বলে, তাদের গোপন কথা গোপনেই থেকে যায়।

ঐ পুতুলটা ছিল আমার খুবই প্রিয়। কখনো আমি কোন পুতুলকেই নিষ্প্রাণ ভাবতাম না। সব পুতুলেরই একেকটা নাম দিয়েছিলাম। তারা ছিল, আমার কাছে একেকটা মানুষের মতো। ঐ পুতুলটা ছিল বন্ধু। খুকুমণি।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। নাকি কয়েক সপ্তাহ? আমার সেই বয়সে, সেটা অনন্তকালের মতো। একদিকে প্রিয় পুতুলের ওপর মমতা এবং অমন সুন্দর একটা বস্তু কাছে রাখার ইচ্ছে, অন্যদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য। সে যে কী ভয়ানক লড়াই!

খেতে ভালবাসিনা কোনোদিনই। সেটাও বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল তখন। চোখের ঘুম চলে গেল। রইল কেবল ক্লান্তি। ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়লে ঘুম আসে। মা-র বুঝতে বাকি রইল না। আমার একটা কিছু হয়েছে। আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।

মন ঠিক করতে পারলাম শেষ পর্যন্ত। আমি উত্তেজিত। কাঁপা কাঁপা হাতে পুতুলটাকে নিয়ে গেলাম ছাতে। নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। চোখে কান্না। সে কান্না বুঝি কোনো দিন থামবে না, মনে হয়েছিল। জ্বরে ভুগেছিলাম তারপর। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতেও আমার মনে দ্বিধা তৈরি হয় আজও সেজন্যে। *

* ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে একটা স্কুলম্যাগাজিনের জন্য এই লেখা।

বাবা ও মায়ের মাঝে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা

আমার মা

ইন্দিরা গান্ধী

পায়নাগাটি আর কাপড়চোপড়ের শখ তাঁর আদৌ ছিল না। অল্পবয়সে মা তাঁর ভাইদের সঙ্গে খেলাধুলো করতেন। এজন্যে তাঁকে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল একবার।

তখন তাঁর বয়স নয় কি দশ। ছিল পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি। সকলের সংগে দিন কয়েকের জন্যে বেড়াতে গেলেন তিনি জয়পুরে। তাঁকে বলে দেওয়া হল বাইরে যদি বেরুতে চাও তো পাল্কিতে চড়ে বেরুতে হবে।

প্রতিবাদে কাজ হল না। পুরোপুরি স্বাধীনভাবে এতদিন চলাফেরা করে হঠাৎ বারণ-মানা কী তাঁর পক্ষে সম্ভব? দিদিমা পড়লেন মুশকিলে। তিনি দেখতে লাগলেন দিন দিন মেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ওজন কমে যাচ্ছে। হঠাৎই তাঁর মাথায় খেলে গেল একটা বুদ্ধি। পরের দিন যেতেই মা তাঁর ভাইদের পোশাক পরে লম্বা চুল পাগড়িতে ঢেকে বাইরে বেরুতে লাগলেন ভাইদের সঙ্গে।

এই ঘটনার ছাপ, তাঁর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মনের ওপর পড়েছিল। যার ফলে, ভয়ঙ্কর পর্দাবিরোধী হয়ে পড়েছিলেন উত্তর জীবনে। আরো একবার তাঁকে পুরুষের পোশাক পরতে হয়েছিল। সেটা ১৯৩০ সালে। মা ছিলেন কংগ্রেসের ভলানটিয়ার।

মা ও মেয়ে

পড়াশুনা চলা কালীন অসুস্থ মাকে সঙ্গ দেবার জন্য ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমকন্যা ইন্দিরা সম্বন্ধে তাঁর পিতা জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তারই প্রতিলিপি।

'উত্তরায়ণ'
শান্তিনিকেতন,
২০ এপ্রিল ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরাকে আমরা সবাই এক মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করতাম ; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তাকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে তাকে আমি দেখেছি ; দেখে-যেভাবে তাকে তুমি মানুষ করে তুলেছ তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করেছি। শিক্ষকরা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসা করেন, ছাত্রমহলেও সবাই তাকে খুবই ভালবাসে। আশা করি আবার সুসময় আসবে, এবং ইন্দিরাও আবার শিগগিরই এখানে ফিরে এসে তার পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে।

সস্নেহ আশীর্বাদ-অন্তে
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায়ই আমাকে মা ছেলেদের পোশাকে সাজিয়ে রাখতেন। অনেকে ধাঁধায় পড়ে যেতেন। জিজ্ঞেস করতেন তোমার ভাই গেল কোথায় ? আমি বলতুম, আমার ভাই নেই। তাঁরা বলতেন যে, নিজেদের চোখেই তাঁরা তাকে দেখেছেন।

বাবার বাড়ি থেকে সতেরো বছর বয়সে তিনি আনন্দ-ভবনের ঝলমলে জীবনে ঢোকেন। তখন আদৌ বুঝতে পারেননি যে, সামনের রাস্তাটা বড় দীর্ঘ এবং বেদনাবহ। সেটা তাঁকে পেরুতে হবে। আমার ঠাকুর্দার তখন আইন-জীবী হিসেবে খুব নাম ডাক। পসার! সবাই তাঁকে মান্যিগান্যি করত। তাঁর মনের জোর যেমন ছিল, তেমনি হৃদয়টাও বিরাট। ভালোভাবেই তিনি জীবনটাকে উপভোগ করতে চাইতেন। আয় করতেন খুব, ব্যয় করতেন বিস্তর। অতিথি অভ্যাগতে বাড়িটা সব সময় সরগরম হয়ে থাকত। উঁচু সরকারি কর্মচারী কবি লেখক—সকলেই আসতেন। ভারতীয়রা যেমন সাহেব-সুবেরো তেমনি। রোজই ভোজ লেগে থাকত। আর ঠাকুরদার দরাজ হাসি।

বাড়িটা ছিল দোমহলা। এক মহলে বিলিতি কায়দায় বৈঠকখানা, অন্য মহলটা দিশি। দু রকমের খানা রান্না হত রোজ। আমার পিসিদের পড়াতেন একজন ইংরেজ গভর্ণেস। সিস্টার ডিকসন নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের গাড়ির শোফার।

আব্রু মেনে চলার রেওয়াজ ছিল না কাশ্মীরী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে। আমার ঠাকুমা তো ইউরোপ অবধি ঘুরে এসেছিলেন। তবুও অতিথি আপ্যায়ন আর সংসারের যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা সামলাতেন আমার মা। ধীরে ধীরে তখন তিনি আধুনিক জীবন যাপনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছেন, তখনই আমাদের গোটা পরিবার ঝাঁপিয়ে পড়ল কংগ্রেসের আন্দোলনে। বদলে গেল জীবন। ঘন ঘন জেলে যাওয়া চলতে থাকল। সঙ্গে নানা রকমের দুর্ভোগ।

তারই মধ্যে আমার মায়ের তেজস্বীতায় আর উদ্দীপনায় গান্ধীজি মুগ্ধ ছিলেন। নারী সমাজের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আহবান ছিল। ঘরের গণ্ডি থেকে তাঁদের বেরিয়ে আসতে হবে, সংগ্রামী ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দায়িত্বের ভাগ নিতে হবে।

তাঁর শৈশবের কথা ভোলেননি আমার মা। গান্ধীজি যেখানে যেতেন, সেখানেই তিনি মেয়েদের পর্দার আড়ালে থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে আসতেন, এবং নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্যে সংকল্প নিতে বলতেন। হাজার হাজার নারী কংগ্রেসের কাজে যোগ দেয় তাঁর ডাকে।

মায়ের অসুস্থতা তখন খারাপের দিকে। তবুও কংগ্রেসের ভলানটিয়ার হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। নেতারা দলে দলে জেলে যাচ্ছেন। আমার মা আরো বেশি উদ্যম নিয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন কংগ্রেসের কাজে। জেলার সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব তিনি এমন উদ্দীপনার সঙ্গে করতে লাগলেন যে, সকলেরই তাক লেগে গিয়েছিল। চারদিকে তাঁর কাজের প্রশংসা।

এতে তাঁর স্বামী জওহরলাল আর শ্বশুর মতিলাল যে, কি খুশিই না হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে কমলার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বিগ্নও।

তিরিশের শেষের দিকে মা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হলেন। তার দিন কয়েক পরে গ্রেপ্তার। একদিন রাত্তিতে শুনলাম, পুলিস আসছে মাকে গ্রেপ্তার করতে। আমরা জেগে আছি। তিনি শেষ করতে ব্যস্ত, তাঁর অসমাপ্ত হাতের কাজ। যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ কোন রকমের অসুবিধেয় না পড়ে।

জনশ্রুতি আছে, দুঃখ আর বিপদের দিনেই মানুষকে সঠিক চেনা যায়। যারা দুর্বল তারা ভেঙে পড়ে আত্মহারা হয়। কিন্তু সাহসীরা দুর্ভোগ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাঁদের ভেতরে লুকোনো শক্তি জেগে ওঠে। সে যেন স্বভাবের গোপন সৌন্দর্য। তাঁদের আরো উজ্জ্বল করে। কমলা নেহরু ছিলেন, এই শেষের দলের মানুষ।

কাউকে কখনো বকতেন না মা। চড়া গলায় কথা কইতেন না। অথচ এমন একটা শক্তি তাঁর ছিল যে, তিনি যা বলতেন সকলকেই তা করতে হত।

আমাদের বাড়ির সংস্কৃত পড়াতে আসতেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের এক আত্মীয়। মাকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। একটু যেন ভয়ও। আমার অবাক লাগত, মা-র মতো অমন মিষ্টি আর আর ক্ষীণ চেহারার মানুষকে কেউ ভয় পাচ্ছে দেখে। পণ্ডিতজী বলতেন, তুমি জানো, তিনি হলেন শক্তির অবতার। যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

শুনে মা হাসতেন। এটা ঠিকই যে, তাঁর সত্যি সত্যিই কিছু শক্তি ছিল। তাঁকে যিনি দেখেছেন, তাঁরই ওপর গভীর ছাপ ফেলেছেন মা। আমার ধারণা, আমার বাবাও আমার মায়ের চিন্তাভাবনায় খুবই প্রভাবিত।

অনেক সাধুসন্ত আসতেন তাঁর কাছে। যদিও ব্রত-পার্বন কিংবা ধর্মীয় আচার তাঁর কোনো ধৈর্য ছিল না! ঘটা করে মন্দিরে যাবার আগ্রহও বড় একটা দেখিনি। অন্তরে ছিল তাঁর গভীর ভক্তি।

মা বলতেন বাইরে পুজোর ভড়ং দেখায় অনেকে। কিন্তু বৈষয়িক চিন্তায় ডুবে থাকে দিনরাত্তির। আমাদের দিয়ে তিনি গীতা আর রামায়ণের আবৃত্তি করাতেন। দিন দিন তাঁর ভেতরে আত্মনিবেদনের আকুতি যেন বেড়ে যাচ্ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা নদীর তীরে তিনি বসে থাকতেন, চুপচাপ। ধ্যানমগ্ন।

গরীবের সেবার কাজে ও শিক্ষার বিস্তারে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। ১৯২৮ সালে আমার ঠাকুর্দা যখন রাজ-প্রাসাদের তুল্য তাঁর বসতবাড়ি কংগ্রেসকে দিয়ে দিলেন, তার নাম রাখা হল স্বরাজ ভবন। সেই বাড়ির একটা অংশে একটা হাসপাতাল খোলেন আমার মা।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি তার পরিবার থেকে প্রিয় স্বদেশের মাটি থেকে, হাজার হাজার মাইল দূরের প্রবাসে চলে গেলেন, আমাদের ছেড়ে। *

* আকাশবাণী থেকে প্রচারিত ভাষণের আংশিক অনুবাদ।

পত্র-প্রেরণা

গার্ডনারের লেডি অব দি হোলি রোজারি জুনিয়র হাইস্কুলের একদল ছাত্রছাত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে ছিল পবিত্র গাভী থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত নানান ধরনের প্রশ্ন। চিঠির উত্তরও দিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। সেই উত্তর গিয়ে পেঁছায় ১লা নভেম্বর '৮৪। মৃত্যুর পরের দিন।

স্কুলের ভূগোল শিক্ষক উইলিয়ম মার্স বলেছেন, এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতই ছটফটে হয়, কিন্তু আমি যখন তাঁর চিঠিটি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তখন ক্লাসে এমন একটা নীরবতা বিরাজ করছিল, মনে হচ্ছিল, ছুঁচ পড়ার শব্দও যেন শোনা যাবে। তারা তাঁর ছবির দিকে যখন তাকাচ্ছিল, তখন তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠছিল আশ্চর্য বিহ্বলতা। এখন তিনি মৃতা। কিন্তু এদের কত কাছা-কাছি তিনি চলে এসেছেন।

টাইপ করা চিঠিতে আটশটি শব্দ। চিঠির তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর। সঙ্গে রয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর নিজের সই! মার্স বলেছেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি নিজের হাতে টাইপ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লিখেছেন, আমি তোমাদের সুন্দর চিঠি পেয়ে খুব খুশি। তোমরা চিঠিতে কী চমৎকার সব ছবি এঁকেছ। তোমাদের প্রত্যেককে তো আলাদা করে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সবাইকে একসঙ্গে চিঠি দিচ্ছি। রাগ করো না যেন। জানো তো, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কত ঝামেলা।

একটি মেয়ে মারিতা ওব্রায়েন লিখেছিল ঃ ভারতে কোন মেয়ের নাম মারিতা রাখা হয় কিনা! তাকে তিনি লিখেছেন, আমি জানি না মারিতা নামটি কোথা থেকে এসেছে। হয়ত মারিসাস থেকে। জানো তো মারিসাস ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ দেশ!

তিনি লিখেছেন, আমেরিকার মত ভারত একটি বড় দেশ। আমাদের দেশে বহু জাত। আমেরিকার মতো নয়।

দুঃখকে ছাপিয়ে লজ্জাই বেশি

অতুল্য ঘোষ

তোমরা নিশ্চই শুনেছ বা কাগজে পড়েছ কিভাবে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় বিশ্বাস করা যায় না।

তোমরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে বা প্রকাশ্যে খুন জখমের গল্প পড়ো। কিন্তু সত্যি সত্যি এসব খুব কম ঘটে। ৩০ অকটোবর প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে যা ঘটল তা সত্যি বইয়ে যে সব গালগল্প বেরোয় তাকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী সকালে জলখাবার খেয়ে বাড়ীর আর একদিকে ওনার অফিসে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ওখানকার নিজেরই রক্ষীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। গায়ে প্রায় ষোলোটা গুলির দাগ। কল্পনা করে যে সব গালগল্পের বই লেখা হয় এ তার চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা।

আর তোমরা তো ইতিহাসে পড়েছ—বিভিন্ন দেশে নানা সময়ে আততায়ীর গুলিতে অনেক প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। আমাদের দেশেই ধরনা—আমাদের দেশে ১৯৪৮ সালে গান্ধীজী এক ব্যক্তির গুলিতে নিহত হন। তবে সে দেহরক্ষীও ছিল না—নিরাপত্তা রক্ষীও ছিল না—সে অন্য জায়গার লোক—তবে ভারতবাসী।

তোমরা তো আমেরিকার নাম শুনেছ। যাকে ইউ-নাইটেড স্টেটস বলা হয়। সেখানে এব্রাহাম লিংকন ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তখন ক্রীতদাস প্রথা আমেরিকায় চালু ছিল। উনি সেই ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেন। আর সেই জন্যই আততায়ীর গুলিতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তবে সেই আততায়ী ব্যক্তিগত রক্ষী বা নিরাপত্তা রক্ষী ছিল না—বাইরের লোক।

এই সেদিন আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট কেনেডি মারা যান আততায়ীর গুলিতে। সে আততায়ী তার রক্ষীও ছিল না—বাইরের লোক। মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত সৈন্যদের প্যারেড দেখতে গিয়ে গুলিতে মারা যান। সে আততায়ীও তার রক্ষী ছিল না—বাইরের লোক। আবার বঙ্গবন্ধু মুজিবর—তিনিও। তারপর জিয়াউর রহমান। তাঁকে তাঁর সৈন্যরা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। এমনি আরও ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু নিজের বাড়ীতে তারা নিজের রক্ষী বা বাড়ীর রক্ষী দ্বারা হননি। হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। আর উনি কত কাজ করতেন—যা সবই আমাদের, ভারতের মঙ্গলের জন্য। আর সেই ভারতবাসীর হাতেই খুন হলেন। এটা খুবই লজ্জার কথা। সেই জন্য আমাদের যা দুঃখ সে দুঃখকে ছাপিয়ে লজ্জাই বেশি হয়েছে।

দুঃখ তো হবেই। যে প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে পৃথিবীর উচ্চাসনের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র দূর করতে চেয়েছিলেন—যাতে সবাই সমান হয় শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াতে চেয়েছিলেন—তাকে জোর করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এ তোমার দুঃখ, আমার দুঃখ—দুঃখ পৃথিবীর সবার।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে। কাগজে পড়তুম আমেরিকা, রাশিয়ার লোক চাঁদে গেছে, মহাশূন্যে গেছে। আর ওঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতবর্ষ থেকে একজন মহা-শূন্যে গেছে। সেকি কম কৃতিত্বের কথা। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের ফসল উৎপাদন অনেকগুণ বেড়েছে।

আমাদের ছেলেবেলা নুন, কয়লা সব বিদেশ থেকে আসত। আর এখন সেখানে কয়লা দেওয়া ইঞ্জিন, ডিজেল দেওয়া ইঞ্জিন—এই দুয়েতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে বিদ্যুত চালিত ইঞ্জিনও তৈরি হয়েছে। পেনিসিলিন—যা খুব কঠিন অসুখের জন্য লাগে এবং যা অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হত। এখন তা সহজেই পাওয়া যায়।

আরও অনেক কিছু করতে হবে। সেই জন্য আরো দুঃখ—যিনি মনে প্রাণে এই কাজ করেছিলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী—তাঁকে জোর করে এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেওয়া হল।

মানুষ জন্মায়, মানুষ মরে। কত লোক আসে, কত লোক যায়। সমুদ্রের ধারে হাঁটার মত। সমুদ্রের ধারে যে বালি সেত মুছে যায়। কিন্তু কারো কারো পায়ের দাগ রয়ে যায়। যা মোছবার নয়। তেমন একজন মানুষকে আমরা হারালাম।

ভুবনেশ্বরে এ, আই, সি, সি-র অধিবেশন মঞ্চে বাবা জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে
কী একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন

তোমরা ছোট; মানে বয়সে নবীন। তোমরা এখন থেকে যদি ভাবো বা জানো উনি কি কাজ করেছেন, তাহলে অনেক উপকার হবে। ভবিষ্যতে তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকেই হয়ত একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ চালাবে।

ছোটবেলায় কি ছিলেন ভাবো না—যাকে বলে রাজকীয়। অথচ গরীব বড়লোক সবার সাথেই সমান ভাবে মিশতেন। গরীব দেখে পেছিয়ে যেতেন না। এ মনোভাব তাঁর যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন ছিল। শুধু যে উনি গরীবের দুঃখ দেখে কষ্ট পেতেন তা নয়, গরীবের জন্য কাজ করে শান্তি পেতেন। এইখানেই তিনি মহৎ।

স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মৃত্যু হয় তাহলেও আমরা কষ্ট পাই! কিন্তু এ মৃত্যুর জন্য যে দুঃখ তার শেষ নেই। এখানে যখন শান্তিনিকেতনে পড়তেন কেউ কোনদিন তার কাজের ফলে বুঝতেও পারেনি তিনি ধন-কুবের মতিলাল নেহেরুর নাতনি। স্বচ্ছন্দে তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে মিশতেন। আবার প্রধানমন্ত্রী হবার পরও যখন আদিবাসীদের সঙ্গে মিশেছেন তখন সেই সব আদিবাসীরা কখনও ভাবতেও পারেনি তিনি পর।

আর মাঝে মাঝে হো হো করে হেসে উঠতেন! ১৯৬৫ সালে—লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী উনি তখন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। সেবারে কংগ্রেস অধিবেশনের আগে আমায় ডেকে বললেন, 'এবার অধিবেশনে আমার তো যাওয়া হবে না। কিছু বিদেশী মন্ত্রী আসবেন। আগে থাকতে সাক্ষাৎকার ঠিক হয়ে আছে।' আমি বললাম, ভাবনা নেই আলাদা প্লেনে নিয়ে যাবো। তখন সেকি খুশি—বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে উঠলেন।

ফেলে আসা দিন

ইন্দিরা গান্ধী

৯ আগস্ট ১৯৪২ সূর্য ওঠার আগেই নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উদ্বোধন। সেই সময়ে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে কাঁদানে গ্যাসের অভিজ্ঞতা হল আমার প্রথম।

আমাদের রাজনীতির বাইরেও ছিলেন আমাদের বন্ধুরা। রাত নিশুতি হলে, তাঁদেরই কারু কারু বাড়িতে পরস্পরের ক্ষণিক দেখাশোনার ব্যবস্থা হত। তখনই খবর পেলাম, আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে। সেই সময় অবধি আমি - যথাসম্ভব ধরাছোঁয়ার বাইরে চলাফেরা করেছি। মন সায় দিল না, এমন ভালো মানুষের মতো জেলে যাবার কথায়। তড়িঘড়ি খানকয়েক জামাকাপড় আর বই নিয়ে অন্য জায়গায় সরে পড়লাম।

কানাঘুষো হতে, হতে, এমন একটা খবর চালু হয়ে গেল যে, ভোর পাঁচটায় জনসভা হবে। ফলে সারা শহর ছেঁকে ফেলল পুলিস। কিন্তু সভা কোথায় হবে, তার কোনো আন্দাজ করতে পারল না।

ঠিক সময়ে আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম! চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে লাগল সেখানে, সঙ্গে সঙ্গে। কোত্থেকে না? সিনেমা থেকে, দোকান থেকে, আশ-পাশের বাড়ি থেকে দলে দলে। আসলে, প্রস্তুতি ছিল। এসব জায়গায় সবাই জড়ো হয়েছিল কয়েক ঘণ্টা ধরে। আমি বক্তৃতা দিতে পেরেছিলাম বড়জোর মিনিট দশেক। তারই মধ্যে ট্রাক বোঝাই গোরা সেপাই এসে গেল। আমাদের ঘিরে ফেলল।

সার্জেন্ট ভদ্রলোক কয়েদী গাড়িতে আমাকে তুলবেন বলে একটা হাত ধরে ফেললেন! ব্যস, সেটা যেন একটা সঙ্কেতের মতো হয়ে দাঁড়াল। উত্তাল জনতা ঢেউয়ের মতো ধেয়ে এল। একটা হাত সার্জেন্টের দখলে অন্য হাতটা কয়েকজন কংগ্রেসী মহিলার দখলে চলে গেল। মনে হল, এবারে দু-টুকরো হয়ে যাব নির্ঘাত!

যাই হোক, বেঁচে গেলাম শেষ পর্যন্ত। গুলি চলেনি। তবে বন্দুকের কুঁদো চলেছে খুব। কয়েকজন জখম হয়েছিলেন। পুরুষ-মহিলার বেশ বড় একটা দল ধরা পড়ল। জেলযাত্রার সেই পর্বটা ছিল একেবারে অভূতপূর্ব ধাঁচেরই।

মনে পড়ে, পুলিসের গাড়িতে সেদিন যে-সব পুলিস ছিল, আমার কথা শুনে তাদের এমন ভাবান্তর হল যে, তারা মাথার পাগড়ি খুলে আমার পায়ের কাছে রেখে জোড়হাতে ক্ষমা চাইতে লাগল। চোখের জল ফেলতে লাগল। দুঃখে আর খেদে। বলল, এই কাজ করতে তারা বাধ্য হচ্ছে নেহাৎই চাকরির মুখ চেয়ে।

আমার জেলে আসা-যাওয়ার সূত্রপাত সেই অস্ফুট শৈশবে। কখনো আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের বিচারের ব্যাপারে। কখনো-বা ভয়ঙ্কর অতৃপ্তি জাগানো, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বিশ মিনিটের দেখাসাক্ষাতের আশায়।

সবাই আমার মা-বাবার কারাবাসের কথা জানেন। কিন্তু কেউই জানেন না, বাবার আর মায়ের দিকের আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে সংখ্যাটা ছিল কী বিপুল। ডজন দুয়েকের নাম তো এখনই আমি মনে করতে পারি। যাঁরা বেশ লম্বা মেয়াদের জেল খেটেছেন। আমার জানা নেই, দেশের মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এত দুঃখ আর দুর্ভোগ সয়েছেন আর কোন পরিবার।

কোনো কিছু বাইরে দেখা কিংবা শোনা, আর সে বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। অন্তত কয়েকটা দিনও যিনি জেল খাটেন নি, তাঁর পক্ষে কারাজীবনে কী গভীর অবসাদ এবং কীভাবে তা সারামন অসাড় করে দেয়, তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

তখনকার উপলব্ধিটা অস্কার ওয়াইল্ডের সেই উক্তির মতোই: একেকটা দিন যেন একেকটা বছর। এবং একেকটা বছর যেন সুবিস্তৃত একেকটা দিন দিয়ে গড়া। ফারাক নেই একটা দিনের সঙ্গে অন্য দিনের। সবই যেন হুবহু এক। একঘেয়েমির রিক্ততা আর ইচ্ছাকৃত অপমানের তেতো দিয়ে মোড়া।

ঠিকই বলেছেন পেথিক লরেন্স। কারাজীবনের মোদ্দা ব্যাপারটা এই যে, তাকে আধা-মানবিক জীবনযাত্রা মেনে নিতে হয়। খোঁয়াড়ে পুরে দেওয়া জন্তুজানোয়ারদের মতো, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাসাঠাসি, তার বসবাস। মানসম্ভ্রমের বালাই নেই, আব্রুর লাজলজ্জা নেই। বাইরের খবরাখবর আর জীবন থেকেই সে শুধু বঞ্চিত নয়,—দুনিয়ার রূপ, রঙ, মাধুর্য কোমলতার লেশমাত্রও নেই সে বেঁচে থাকায়।

যেখানে আমরা ছিলাম, সেখানকার উঠোন, মেঝে এবং চতুর্দিকের দেয়াল সবই ছিল যেন মেটে রংয়ের। কাপড়-চোপড়গুলি অবধি কদিন কাচাকাচির পরই মেটে রংয়ের হয়ে গেল। এমন কি, খাবার-দাবারের স্বাদটা অবধি মেটে। গরাদ লাগানো ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বোশেখী ধুলোর ঝড়, আষাঢ়ের বর্ষণ, পৌষের হিম আমাদের শরীর

ও মন ছুঁয়ে যেত মাঝে মাঝে।

সকলেরই বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত। দু-একখানা চিঠিও আসত। আমার আবার ওসব ছিল না। আমার স্বামীও তখন একই জেলে। অনেক চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ওঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর।

আমি অবশ্য বই পড়ে এবং অন্যদের পড়িয়ে নিজেকে খুশিতে রাখার একটা উপায় বের করেছিলাম। একটা বাচ্চা নিয়ে একটা মেয়ে জেলে এসেছিল। তাকে পড়াতাম। ছাড়া পাবার পর, যাতে মেয়েটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বাচ্চাটার যাবতীয় ঝক্কিঝামেলা সামাল দেওয়ায় দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম।

বছর সাতেক কয়েদ হবে ধরেই নিয়েছিলাম। মনস্থিরও করেছিলাম, সব রকমের দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সইব। সেদিনের কত ছবিই না আজ মনে পড়ছে!

সেবার একটা ঘটনা ঘটল। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর একজন সিভিল সার্জন ডাক্তারকে পাঠালেন জেলে। কারণ, আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। জনসাধারণ খুবই উদ্বিগ্ন।

সিভিল সার্জন বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা করলেন এবং টনিক লিখে দিলেন। ওভালটিনের মতো একটা সৌখিন পথ্যের বিধানও তার মধ্যে ছিল।

তিনি চলে যাওয়া মাত্র সুপারিনটেন্ডেন্ট সেই ফর্দটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, আপনি যদি ভেবে থাকেন, এইসব জিনিস আপনাকে দেওয়া হবে, তাহলে ভুল করেছেন।'

বিস্মিত হবারই মতো এই ব্যাপার কারণ, কিছুই আমি চাইনি। এমন কি, সার্জেনের আসাটা অবধি অপ্রত্যাশিত।

রাতের বেলা, একদিন ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম ভয়াবহ একটা রক্ত হিমকরা চিৎকারে। আমাদের একটা ওয়ার্ড্রেস ছিল। তার নাম জোহরা। জোহরার স্বভাবটা ছিল অতি বাজে ধরনের। সেজন্য কেউই তাকে পছন্দ করত না।

তবুও একটু মায়াই হল। কেননা, তার ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণও ছিল। আমাদের গরাদের কয়েক হাত দূরে একটা বিশাল গোখরো সাপ একটা ঘন্টার নিচে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। ওয়ার্ডে চক্কর দিতে বেরুলেই সেটা তাকে পিটোতে হত। সাপের কামড় খাওয়ার বিপজ্জনক পরিণতির কথাটা বাদ দিলেও, তার চাকরি খোয়ানোর ভয়টা অমূলক ছিল না।

আমরা ছিলাম ব্যারাকের ভেতরে। আর সে বাইরে। বাইরের পাঁচিলের কিছুটা ভেতরে। হাতে অস্ত্র ছিল না। এমন কি একটা লাঠিও না।

মজা হচ্ছে, জোহরা যেমন প্রাণপণে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, একেকবার শাসাচ্ছে—তেমনি পরের মুহূর্তেই কাকুতি-মিনতিও করছে। বাইরের দিকের পাহারাওয়ালাটি তাতেও নির্বিকার। জানতে চাইছে, সাপটার দৈর্ঘ্য কত, প্রস্থ কত, কোন জাতের সাপ, ঠিক কোনখানটায় এখন আছে ইত্যাদি! খুবই চুলচেরা জিজ্ঞাসা।

উত্তরে জোহরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছে। আর বলছে, ওরে পোড়ারমুখো, সব্বোনেশে, আমার হাতে কী দর্জির ফীতে আছে, যে, সাপের মুন্ডু থেকে লেজ অবধি মেপে বলব?

বেশ কয়েকটা ঘণ্টা এরকম কথা চালাচালির পর পাহারাওয়ালাটি মেট্রনকে ডাকতে গেল। রশিতিনেক দূরে তার বাড়ি। মেট্রন আবার খবর পেয়ে দৌড়ল সুপারিনটেন্ডেন্টের বাড়ি। তারপর সদর দপ্তরে গিয়ে তারা জেনানা ফাটকের চাবি সংগ্রহ করল।

ছোটখাট সেই মিছিলটি যখন আমাদের মহলে পেঁছুল, তখন আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। সাপটাও উধাও।

আর একদিনের ঘটনা। সামান্য একটুখানির জন্যে আমরা পুড়ে মরিনি।

তখন লড়াই চলছে। ক্যান্টনমেন্টে কেবল ইংরেজই নয়, মার্কিন আর কানাডিয়ান সৈন্যও অনেক। পয়লা নম্বরের এক কানাডিয়ান পাইলট আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্টের খুবসুরৎ মেয়ের টানে বাঁধা পড়ল। প্রায়ই সে তাদের বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে খুব নিচু হয়ে উড়ে যায়।

সেদিনও যাচ্ছিল। কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল টেলিগ্রাফের তারে ধাক্কা খেয়ে। আমরা দেখলাম, সামনের দিকে উল্কার মতো ছুটে আসছে ওই বিমান। হঠাৎ জেলের পাঁচিল ডিঙিয়ে খানিকটা দূরের একটা অর্ধসমাপ্ত বাংলোর ছাতে ভেঙ্গে পড়ল।

এইসবও একদিন ফুরোলো। কিছুই থেমে থাকে না। অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে আসার মতো, আমার কারামুক্তির খবর এল। অপ্রত্যাশিত। জীবনের উজ্জ্বল সমারোহে আমার দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। সে কী তার রঙের বৈচিত্র্য, সে কী তার বিন্যাসের ঘটা। কতই না তার সুখের পর্দা, চিন্তার বিপুলতা। এত কিছুর ছোঁয়ায় আমি যে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আমার বেশ কিছুটা সময়ই লাগল।

---

* সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে 'উইমেন অন দি মার্চ' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধের অংশ বিশেষের অনুবাদ।

ভুবনেশ্বরী

সুধীন্দ্র সরকার

ক'াদছে চাষী, ক'াদছে মজুর,
ক'াদছে প্রতিবন্ধীরা ;
হিমালয় থেকে নীল জলধির
ভারত, হারাল ইন্দিরা !

সন্ত্রাসবাদী, গুপ্তঘাতক
এমন কী জেল-বন্দীরা
লুকিয়ে মোছে অশ্রুধারা,
কোথায় তুমি ইন্দিরা ?
সব সুরেতেই বেহাগ এখন
সেতার, বীণা, মন্দিরা,
আকাশ থেকে খস্‌লো তারা—
সেই তারাটি ইন্দিরা ।
ভুবনেশ্বরী ইন্দিরা ।।

শান্তিনিকেতনে

শান্তিনিকেতনে কিছু ছেলেমেয়ে ওকে একটু আলাদা-ভাবে দেখতে চাইলেও ইন্দিরা সেই পার্থক্যটুকু পছন্দ করতেন না।

ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে থাকতেন মেয়েদের হস্টেল—'শ্রীভবনে'। আর সবার সঙ্গে খেতেন। কিচেনের ঘরে। কোন কোন ছাত্রী যখন খাওয়ার মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করত, ইন্দিরা কিন্তু কখনো, এই নিয়ে নালিশ জানাননি। হাসি মুখে তৃপ্তি করে খেতেন।

কমলা নেহেরুকে যখন চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ড নিয়ে যাওয়া হয় তখন জওহরলাল মেয়েকে রেখে যান গুরুদেবের কাছে, যাতে পরিপূর্ণ শিক্ষা হয়। জওহরলালের এই ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি, কারণ মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি হওয়াতে কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দিরাকে সুইজারল্যান্ডে চলে যেতে হয়।

জওহরলালের মেয়ের কিন্তু সাধারণ পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশে যেতে অসুবিধা হয়নি।

একবার ইন্দিরা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বৌঠান (প্রতিমা দেবী) ওকে নিজের কাছে এনে রেখে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে চেয়েছিলেন। ইন্দিরা হেসে বলছিলেন, কেন বৌঠান, আমার তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না, আমি তো ভালই আছি'। অথচ তখন কিচেনে খাওয়া নিয়ে অন্য মেয়েরা প্রায়ই অভিযোগ করত।

জওহরলাল চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে থাকতে পেয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিক্ষা লাভে আগ্রহী হবে। ইন্দিরারও সেই আগ্রহ ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দিরা ছোট ছোট নাচের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

ইন্দিরা দেখতে বেশ রোগা ছিল বটে কিন্তু খেলা-ধুলোতেও ওর খুবই উৎসাহ ছিল। শান্তিনিকেতনে ছেলে-মেয়ের খেলাধুলোর সুযোগ ছিল প্রচুর। ইন্দিরা, অন্যান্য মেয়েদের সাথে উৎসাহের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলতেন। চাইতেন স্কোর করতে, সেজন্য মাঠের মধ্যে রেষারেষিটা খুব জমে উঠতো। খেলার পরে মাঠে গোল হয়ে বসে আবার গল্প গুজবও হতো।

গৌড় প্রাঙ্গণের সামনে লাইব্রেরীতে একটা ঘর ছিল মেয়েদের 'কমনরুম' সেখানে ইন্দিরা ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই আসতেন, সেখানে অন্য মেয়ে থাকলে খুব মন খুলে গল্প করত। জওহরলালের মেয়ে বলে নিজেকে আলাদা বলে ভাবতেন না। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পারতেন। ইন্দিরা হয়তো নিজে গায়ে পড়ে আলাপ করতে

পারতেন না, বা অতিরিক্ত উচ্ছাস ওনার ছিলনা। তাই অনেকে ওনাকে লাজুক বলে ভাবত, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। উচ্চবিত্ত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের বিখ্যাত বাবার আদরের একমাত্র মেয়ে কিন্তু আর পাঁচজন মেয়েদের সাথে সহজেই মিশে যেতে পারতেন। আর সেই সাধারণ মেয়েদের মনেও রাখতেন ইন্দিরা।

জওহরলাল আর কমলা নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা, মতিলাল নেহরুর নাতনি, শান্তিনিকেতনে আসেন—গুরুদেবের আশ্রমে শিক্ষা নিতে। ইংরেজি না, পুরোপুরি ভারতীয় ধাঁচের শিক্ষা। তখনই চারপাশের গাছগাছালি, আদিবাসী নরনারী এবং ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা পাকাপোক্ত হয়। নন্দলাল, রামকিঙ্কর আর বিনোদবিহারীর সঙ্গে পরিচয়। সেকথা তিনি কোনদিন ভোলেননি। খুবই চটপটে ছিলেন। সহপাঠী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নানারকমের মজা করতেন, কৌতুক করতেন।

বড়লোকের মেয়ে নাতনি হওয়ায় কেউ কেউ তাঁকে আলাদা চোখে দেখতেন। নিশ্চয়ই হোস্টেলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে একথা ভেবে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ একবার তাঁকে বলেন, ইন্দু যদি ইচ্ছে করো তো আমার এখানে এসে খেতে পার। কিন্তু কিশোরী ইন্দিরা বলেন, 'না না, আমি তো হোস্টেলে বেশ ভালোই আছি। সকলের সঙ্গে খাচ্ছি-দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেটাই ভাল লাগছে।'

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাটা তাঁর জীবনে বিফলে যায়নি। কাজে লেগেছে।

অরণ্যে ইন্দিরা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একবার বাঘের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে কর্ণাটকে ভাষণ দিয়ে তিনি অতিথিশালায় ফিরছিলেন। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে আসার সময় একটা বাঘ তাঁর গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর চালককে গাড়ীর আলো নিভিয়ে দিতে বললেন। আলো নিভে গেলে অন্ধকারের মধ্যে বাঘটা পালিয়ে যায়, এবং শ্রীমতী গান্ধী নিরাপদে অতিথিশালায় ফিরে আসেন।

এই ভাবে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির ফলে শ্রীমতী গান্ধী সেদিন রক্ষা পান।

স্মরণ

মুস্তাফা নাশাদ

মৃত্যুকে ভয় পাওনি কখনো,
মৃত্যুর মুখোমুখি
হয়ে ছিলে বহুবার তুমি
নিয়ে জীবনের ঝুঁকি।

শেষ নমস্কার জানিয়ে গেলে
তোমারই খুনী রক্ষীকে!
বিশ্ব কি আর কখনো পাবে
তোমার মতো লক্ষ্মী কে?

আমার প্রিয়

ইন্দিরা গান্ধী

যখন যেখানে থাকি, সেখানকার খাবার খেতেই আমার ভালো লাগে। তবে খুব মালমশলা দেওয়া না। সাদা-সিধে রান্না। পশুপাখির দিকে টানটা অনেকদিনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন আমি লন্ডনে ছিলাম তখন এক আসরে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, ধরুন আপনাকে একটা জন্তু হতে বলা হল। তো, কোন জন্তুটা হতে আপনার ভালো লাগবে? আমি চটপট উত্তর দিয়েছিলুম, ভারতের কৃষ্ণসার হরিণ। একথা শুনে একজন মন্তব্য করেন, আমার আয়ত চোখ, হালকা গড়ন এবং আমি খুব দৌড়তে পারি বলে হরিণ হতে চেয়েছি।

সকলেরই প্রিয় জিনিসের তালিকায় সম্ভবত বই থাকে। আমাকে কিন্তু টানে বেশি ডিকশনারি। বিশেষ করে, যাতে শব্দ আর বাক্যাংশের মূলটা দেওয়া থাকে, সেই ধরনের ডিকশনারি।

আমার খুবই ভালো লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটতে। আমার মুখের ওপরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির টাটকা জল পড়ছে, আমি হাঁটছি। ভালো লাগে প্রথম বর্ষায় ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, যাকে হিন্দীতে বলা হয় সোঁধী। আর বৃষ্টিধোয়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট যখন ঝকঝকে হয়ে যায় গাছের পাতা চকচক করে তার ওপরে জলের ফোঁটা ঝকঝকিয়ে ওঠে।

খুশি হই গাছের নতুন এবং নরম কচিপাতা দেখে। ফুল দেখে। বিশেষ করে বুনো ফুল আমায় টানে খুব। কত অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই করেই না ওরা বেঁচে থাকে। জল-মাটি হাওয়ার বৈষম্য ও বৈচিত্র্যে ফুটে ওঠে। তারও চেয়ে বেশি ভালো লাগে আদ্যিকালের গাছগাছালি, যার ডালপালা অনেকটা দূর অবধি ছড়ানো গাঁটে গাঁটে বয়সের ছাপ। সেইসব গাছের ছায়া ভারি আরামের। পুরাণকথার মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সব পাহাড়ই আমার প্রিয়। সেটা রুক্ষ অনুর্বর বালি আর পাথরের স্তূপ হলেও। সে যেন মনের জোর বাড়িয়ে দেয়, অক্লান্ত চলার উদ্যম জোগায়। পাইনের সুগন্ধীভরা নিচু পাহাড়ে গিয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ি। চিরতুষারে ঢাকা পর্বতে ভীষণ সুন্দর সব গ্লোসিয়ার। বনের যেখানটায় পথ নেই, সেখানটা আরো ভালো। আমার ছেলেরা যখন ইস্কুলে পড়ত, প্রতিবছর গরমের ছুটিটা ওরা পাহাড়ে কাটাত। আমরা তাঁবু খাটিয়ে, শহর থেকে যতদূরে পারি তত দূরে। পাইন অরণ্যের মাঝখানে তাঁবু ফেলে, বরফ গলা নদীর জলে স্নান করতাম। শরীর মন জুড়িয়ে যেত।

যত রকমের শব্দ আছে, তার মধ্যে আমার প্রিয় নদীর কুলুকুলু, বৈঠার ছলাৎ-ছলাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট। ঠিক এরকমটি কানজুড়ানো না হলেও ট্রেনের হুইসিল জাহাজের ভোঁ, কোথায় যেন যাওয়ার ডাক দেয়। আসল কথা, ট্রেন আর জাহাজও আমার খুব প্রিয়। যখন সফরে বেরুই, পুরোনো কেল্লা খুঁজি। সেটা আমার অনেকদিনের শখ। কেল্লার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিগতদিনের কাহিনী জানতে ইচ্ছা করে। দেয়ালের আঁকাবাঁকা অপরূপ রেখা মনের ওপর দাগ কাটে। কত আশা কত কামনা কত বিপদ আপদের স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে সেসবের সঙ্গে।

ঘাসের ওপরে বসতে আমার ভালো লাগে। তবে, পোকামাকড় যদি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে শিউরে উঠি। সেসব যেন না থাকে। তখনই মায়ের কোলে বসে আছি, মনে হয়। খালি পায়ে হাঁটতে ইচছে করে শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে। অল্প বয়সে গাছের উঁচু ডালে পাখির মতো থাকতে থাকতেও মনে হত, প্রকৃতির সঙ্গে যেন একাত্মা হয়ে মিশে গেছি।

যাঁরা শাড়ি কিংবা ঐ রকমের ঢিলেঢালা পোশাক পরেন তাঁদের কাছে ঝোড়ো-হাওয়া দুচক্ষের বিষ। উৎপাত বিশেষ। কিন্তু ফসলের ক্ষেতে ঝিরঝির হাওয়া ঢুকে যখন ধানের শীষ, ঘাসের ডগা দুলিয়ে দিয়ে যায়, তখন সেটা দেখবার জিনিস হয়ে ওঠে।

অতি প্রাচীনকালের গাছ আর পুরোনো কেল্লার মতো, সার্বেক ঢঙের সার্বেক আমলের বাড়ি আমার খুব ভালো লাগে। সেকালে জীবন কত সরল ছিল। ভালো লাগে পুরানো বই কাগজপত্র মানচিত্র। আর ভাত বাড়ার ও জলতোলার পুরোনো গড়নের দিশি বাসন তামার পাত্র—এমনি আরো কত কী!

প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব রূপ আর বৈশিষ্ট্য আছে। দেখি, মন যখন হাঁফিয়ে ওঠে সেই ঋতু ফুরিয়ে গেছে, অন্য ঋতু হাজির। উষ্ণমন্ডলের যারা বাসিন্দা, তাঁদের এই এক অসুবিধে। এটা ঠাহর হয় না। শরতের নরম হলুদ নীল আলো ভারতের সমতলভূমিতে এসে কোনোদিন পৌঁছয় না। ধূসর বাদামি পৃথিবী দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ব, জেগে উঠে দেখব—পৃথিবী শুয়ে আছে ঝকমকে রুপোলি ওড়না জড়িয়ে—তার উপায় এখানে নেই। ধবধবে সাদা, গভীর সদ্য ঝরেপড়া তুষারের মতো মনোরম দৃশ্য অতি অল্পই আছে।

---

১৯ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের অনুবাদ।

আমার প্রতিজ্ঞা

ইন্দিরা গান্ধী

"...আমার ওপর বহুবার নানারকমভাবে আক্রমণ হয়েছে। ..কিন্তু এসবে আমি ভয় পাইনা। আমাকে যদি মেরে ফেলার চক্রান্ত হয় তাতেও আমি শঙ্কিত নই। আমি এই দেশকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভালোবেসে যেতে চাই।..."

—ইন্দিরা

ছত্রিশ বছর আগে এই বিশেষ দিনটিতে হাজার হাজার কণ্ঠের সঙ্গে আমিও কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক প্রাণস্পন্দী শপথ ঘোষণায়।

১৯৪৭ সালে সেই শপথ পূর্ণ হয়েছিল। বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছিল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্দীপ্ত এক নতুন প্রগতিশীল শক্তিকে। জওহরলাল নেহরু যে ১৭ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সমাজ ও ভাষার প্রভেদ সত্ত্বেও দেশের ঐক্য এক বাস্তব রূপ নিয়েছিল। জন্ম হয়েছিল গণতন্ত্রের। অচিরেই সেই গণতন্ত্র জাতির জীবনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির সাহায্যে আমরা এক উন্নততর জীবন রচনার জন্য সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলাম। নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য ভারতের সোচ্চার সরব কণ্ঠ বহু মানুষের মনে জুগিয়েছিল আশা আর সাহস। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের শান্তি ও মুক্তির বাণী বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী ও ঐক্যের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

শাস্ত্রীজী তাঁর স্বল্প-দীর্ঘ কিন্তু স্মরণীয় নেতৃত্বের দ্বারা তাঁর নিজের মতন করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জাতীয় লক্ষ্যের পথে তিনি ধাবিত হয়েছিলেন দৃঢ় সংকল্প চিত্তে। মাত্র গতকাল তাঁর মরদেহের দগ্ধাবশেষ আমরা পবিত্র নদীর বুকে বিসর্জন দিয়ে এলাম। সমস্ত দেশ এই বিরাট ক্ষতির জন্য গভীর শোকে অভিভূত। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অভাব খুব বড় করে অনুভব করছি, কারণ তাঁর সঙ্গে অনেকদিন আমি কাজ করেছি।

আমি নিজে যে কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হই অত্যন্ত বিনীতভাবে। গান্ধীজী ও আমার বাবা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, বিশেষ করে ভারতের জনগণের উপর আমার অসীম আস্থা আমাকে সর্বদা শক্তি ও বিশ্বাস যোগায়। ভারতবর্ষের অদম্য জীবন-রসের প্রমাণ পাওয়া গেছে বার বার। অতীতের মত সাম্প্রতিক কালেও ভারতবর্ষ চ্যালেনজের মোকাবিলা করার মত শক্তি ও সাহস দেখিয়েছে। ভারতীয়দের পিছনে রয়েছে এক শক্ত ভিত্তিভূমি, তা যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে।

আমাদের সামনের দিনগুলি সংকটাকীর্ণ। আমাদের অজস্র সমস্যা আছে যার দ্রুত সমাধান দরকার। বৃষ্টি হয়নি বলে অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে খরা। যেমন আশা করা গিয়েছিল বিদেশ থেকে তেমন অর্থনৈতিক সাহায্য আসেনি, রফতানি থেকে আয়ও তেমন হয়নি। বিদেশি মুদ্রার অভাবে শিল্প উৎপাদন দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এই সব অপ্রত্যাশিত সংকটে আমাদের হতাশ হলে চলবে না। তাদের সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। ভুলভ্রান্তি থেকে আসুন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, যাতে ভবিষ্যতে এসব ভুল আর না ঘটে। মাঝে মাঝে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই কী কী ব্যবস্থা আমি নিচ্ছি সেই ব্যাপারে। আমি আমার কাজে আপনাদের সমর্থন চাই।

সবার ওপর এই অনটনের বছরে আমাদের জনগণের যাতে খাদ্যাভাব না হয় সেটি দেখা দরকার! এটি সরকারের প্রথম কর্তব্য। আমরা পরিচালনা ব্যবস্থা এবং খাদ্যশস্যের সুষম বন্টনের দিকে দৃষ্টি দেব। রেশম ব্যবস্থা, খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যাপারে আমাদের প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য রাজ্য সরকারগুলির কাছে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা চাই। কেরলের মত রাজ্য, যেখানে খাদ্য সংকট লেগেই আছে, আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা প্রস্তাব করেছি বাইরে থেকে আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হবে ঘাটতি পূরণের জন্য। আমেরিকার কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ পেয়েছি। তারা আমাদের সমস্যাটা বুঝে দ্রুত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

একমাত্র অধিক উৎপাদনই আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। এখন আমাদের অনেক ভেবে চিন্তে জল, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল নানা ধরনের বীজ, কারিগরি উপদেশ এই সব নিয়ে একটা পরিকল্পনা করতে হবে। কৃষির মত এত আত্মবিশ্বাস আর কোথাও দরকার

"...আমার ভারি বিরক্ত লাগে, আমার দেহরক্ষীদের কাণ্ড দেখে। আমাকে রক্ষা করতে ওরা এমন ভাবে ঘিরে রাখে, জনসাধারণ আমার হাতে ফুল দিতে পারেনা। আমার দিকে তখন ফুল ছুঁড়তে থাকেন তাঁরা। রক্ষীরা বোঝেনা অত ফুল আমার গায়ে ছুঁড়লে, তাতেই আমার চোট লাগার কথা। তার থেকে রক্ষীরা সরে দাঁড়ালেই ভালো। তাতে লোকেরা আমার হাতেই ফুল দিতে পারবেন।" — ইন্দিরা

হয় না। এর মানেই হল বেশি উৎপাদন। শুধু দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যই নয়, রফতানির স্বার্থেও উৎপাদন বাড়ান দরকার। আমাদের গ্রামের লোকদের সময় ও কর্মক্ষমতার উপযোগী করে নতুন নতুন পথ বার করতে হবে। তাদের নির্মাণ-কাজে লাগাতে হবে। গ্রামীণ কর্ম প্রকল্পে আমাদের নতুন গতি সঞ্চার করতে হবে। দেখতে হবে যাতে গ্রামের মজুরদের পারিশ্রমিকের হার বাড়ে।

অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে জাতীয় স্তরের কাজকর্মের মতই অভিপ্রায় ও প্রকৃত কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই ফারাক দূর করার জন্য প্রশাসনের ব্যাপারে যে সব পরিবর্তন ঘটান দরকার সেগুলি ঘটাতে হবে। আমরা নতুন অরগানাইজেশন প্যাটারনের প্রবর্তন করব! ম্যানেজ-মেন্টের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ম্যানেজমেন্ট টেকনিক প্রবর্তন করব। আমরা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে বড় রকমের দক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তাবোধ আনার চেষ্টা করব এবং এই প্রশাসন যন্ত্রকে ভারতের প্রয়োজনের অনুবর্তী করে তুলব।

আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা বরাবর শান্তির নীতি অনুসরণ করে এসেছি। সমস্ত জাতির সঙ্গে আমরা মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে এসেছি। কিন্তু তা বলে আমাদের স্বাধীনতা আমরা বিসর্জন দিইনি। আমাদের এই বিদেশনীতি আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুসারী। এই নীতি যথাযথ বহাল থাকবে। আমার বিদেশ সফরের সময় সরকার ও সরকারের বাইরের নেতাদের সঙ্গে আমি দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। সব সময় দেখেছি আমাদের ভূমিকা তাঁদের প্রশংসা অর্জন করেছে। আমার আন্তরিক কাজ হবে শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যাতে করে সমস্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হতে পারে। তাসখন্ড ঘোষণা এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। আমরা অক্ষরে অক্ষরে এই চুক্তি পালন করব।

আমাদের লক্ষ্য শান্তি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী আমি জানি। আমরা তাই সব সময় সতর্ক থাকব নিরন্তর নজর রাখব, প্রয়োজনমত আমাদের প্রতিরক্ষা বাড়াব।

তারুণ্যের সুযোগ অনেক বেশি। আমাদের তরুণেরা মনে রেখ, তোমরা দেশকে আজ যা দেবে, কাল তাই পাবে। তাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা, তারা যেন উচ্চাশা না হারিয়ে ফেলে, সবাইকে যেন তারা ছাড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান ও কলার পৃথিবী, ভাবনা ও ক্রিয়ার পৃথিবী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নতুন নতুন সীমান্ত তাদের অতিক্রম করতে হবে, নতুন দিগন্তে পাড়ি দিতে হবে, নতুন লক্ষ্যে এসে পৌঁছতে হবে।

আমাদের ধর্ম, ভাষা ও রাজ্য আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমরা এক জাতি, এক প্রাণ—আসুন আমরা চাষী, মজুর, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী সকলে মিলে নিজেদের শক্তি দেখাই। আসুন আমরা শক্তিশালী হই, সহনশীল হই। সহনশীলতা আর শৃঙ্খলাই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। গতিশীল ও প্রগতিশীল সমাজ—ন্যায়পরায়ণ সমাজ যা আমাদের প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা সেটি তখনই সম্ভব হবে, যখন কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আন্তরিক উদ্দেশ্যের পরিমন্ডল গড়ে তুলতে পারব। আজ আমি নতুন করে শপথ নিচ্ছি, সে শপথ হল, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিকল্পিত অর্থ-নীতি, সামাজিক প্রগতি ও দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শে আমরা অবিচল থাকব।

ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন। আমাদের ভাগ্যকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের শক্তিকে নতুন করে রূপ দিন। এক বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানে আমরা সকলে সহযাত্রী। আমরা আমাদের এই মহান দেশের যে যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠি। জয় হিন্দ।

১৯৬৬ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হবার পর জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার ভাষণ দেন সেটি প্রকাশ করা হল।

কার্টুন ঃ চণ্ডী লাহিড়ী

ইন্দিরা গান্ধী ও বিজ্ঞান

অমিত চক্রবর্তী

ইন্দিরা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের খবরে সকলেই হতচকিত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। জনৈক বিজ্ঞান-সাংবাদিক বন্ধু বললেন—রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, তা তো আর বলার নয়, তবে আমার মনে হয়, ইন্দিরাজীর মৃত্যুতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো দেশের বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদের। ইন্দিরাজী যেন বিজ্ঞানীদের একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দিয়ে দিয়েছিলেন। গবেষণার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সামনে আর্থিক বা অন্য কোনও বাধা আসুক তা তিনি কখনও চান নি।

সাংবাদিক বন্ধুটির কথা যে কতখানি সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্য বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই। ১৯৮২ সালে ভারতের প্রথম যোগাযোগ—উপগ্রহ 'ইনস্যাট—১এ' অসময়ে বিকল হয়ে যাওয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো সারা দেশে। লোকেরা বলতো—মহাকাশ সম্পর্কে ব্যয়বহুল গবেষণার মধ্যে আমাদের মত গরীব দেশের যাওয়ার দরকার কি? রাশিয়া-আমেরিকার টাকা-পয়সার অভাব নেই, সুতরাং তারা চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারে। পৃথিবীর চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘোরাতে পারে। বছর কয়েক আগে ভারতের রোহিনী উপগ্রহ বিকল হয়ে যাওয়ার পরও একই কথা বলা হয়েছিল। অথচ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিফলতায় ইন্দিরা গান্ধী কখনই দমে যান নি। মহাকাশ-বিভাগটা তিনি নিজে দেখাশুনো করতেন এবং মহাকাশ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তার নিজের অত্যন্ত আগ্রহ ছিলো বলেই হাজার বাধা সত্ত্বেও মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। জনৈক মহাকাশ বিজ্ঞানী বলেছেন—প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ না থাকলে অর্থের অভাবে বহু আগেই দেশ থেকে মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের পাততাড়ি গোটাতে হতো। কথাটা নিখাদ সত্যি। মহাকাশ-বিজ্ঞান যে দেশের আপামর মানুষের কতটা কাজে আসতে পারে সে ব্যাপারে একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিলো ওঁর। আজ যখন দেখি—আমাদের জাতীয় উপগ্রহ 'ইনস্যাট—১বি, একাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ জরীপ, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ, টেলিভিসন অনুষ্ঠান সম্প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারে কি অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে—তখন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার কথা না ভেবে পারা যায় না। দেশটাকে এক সুতোয় বেঁধে রাখতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে যে সুদৃঢ় করা দরকার এবং সেজন্য ইনস্যাট-এর মতো যোগাযোগ উপগ্রহের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই—সে কথাটা ইন্দিরাজী মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন।

শুধু মহাকাশ কেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সব ক'টি শাখাই ইন্দিরাজীর সমর্থনে পুষ্ট হয়েছে। উনি বিশ্বাস করতেন—আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া দেশকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওঁর নিজের ভাষায়—"আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনে, আমাদের সকল উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সর্ব অঞ্চলে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে হবে। না হলে তা কেবল দেশের ভেতর বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেবে যা গত ২০০ বছরের মধ্যে ঘটেছিল। বিজ্ঞানকে হতে হবে পরিবর্তন এবং মুক্তির মাধ্যম এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথী। বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যখনই আমার দেখা হয় তখনই আমি তাদের বলি তাঁরা যেন ভারতের প্রগতির কর্মযজ্ঞে অংশীদার হন এবং আজ ও আগামীকালের কথা চিন্তা করেন।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি যে মানবসভ্যতাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় সে কথাটা ইন্দিরাজী যেমন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তেমনি তিনি এও জানতেন যে তার সুফলগুলি ভোগ করেন উন্নত দেশের মানুষ যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন। ব্যাপারটাকে তুলনা করতে গিয়ে ইন্দিরাজী বলেছেন, "একটা আধুনিক গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন সেই সব মানুষেরাই যাঁরা খানিকটা লেখাপড়া শিখেছেন। যার এখনও অক্ষর পরিচয় হয় নি, তার কাছে গ্রন্থাগার থাকা আর না থাকা—দুই-ই সমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকতে হবে। তা বলে এই নয় যে আধুনিক প্রযুক্তির দিকে ঝোঁকা মানেই পশ্চিমী প্রযুক্তির অন্ধ অনুকরণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে। যা কিছু পুরোনো, তা যদি আমাদের কাজে না লাগে, তাকে বর্জন করাই শ্রেয়।"

১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারত যখন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তখন অনেকের ধারণা হয়েছিলো—ভারত এবার অ্যাটম বোমা বানাবে। ধারণাটা যে ভুল তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন—ভারত শুধুমাত্র পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে লাগাবে। পণ্ডিতজীর ঐ ঘোষণা থেকে

ইন্দিরা গান্ধী কখনও সরে আসেন নি ; শুধু তাই নয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যে আজ পরমাণু অস্ত্র বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন বারে বারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশে দেশে আজ যে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে ভারত যাতে পিছিয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সব সময় খেয়াল থাকতো ওঁর। ভারতে বিজ্ঞানের এমন অনেক শাখায় আজ গবেষণা চলছে যার হয়তো তাৎক্ষণিক কোনও সুফল নেই। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষিণ-মেরু অভিযানের কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে দিন দিন যে হারে লোক বাড়ছে, যে হারে স্থলজ সম্পদ ফুরিয়ে আসছে তাতে সমুদ্রই যে আমাদের শেষ ভরসা—ইন্দিরাজীকে সেটা বোঝাতে কষ্ট হয় নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা—আজকের প্রায় অজানা দক্ষিণ-মেরু হয়তো আগামী দিনে আমাদের বেঁচে থাকার বিপুল রসদ যোগাবে। সে রসদ থেকে ভারতীয়রা যাতে বঞ্চিত না হয় সে কথা ভেবেই ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয়দের দক্ষিণ-মেরু অভিযানে আগ্রহ দেখিয়েছেন ; ওঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ছাড়া ঐ অভিযান হয়তো আদৌ সম্ভব হতো না।

বিজ্ঞান-গবেষণার আর একটা দিকও আছে। সব সময় যে এ থেকে আর্থিক লাভ হবে এমন মনে করার কারণ নেই। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। রাকেশের মহাকাশে যাওয়াটা দেশের কোনও আর্থিক উন্নতি ঘটায় নি। কিন্তু ঘটনাটা আমাদের গর্বিত করেছিল। আমরাও যে পশ্চিমী মানুষদের মতো অসাধ্য সাধন করতে পারি—সেই বোধটা আমাদের মধ্যে এনে দিয়েছিলো। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্দিরাজীর ব্যক্তিগত আগ্রহের এটাও একটা বড় কারণ।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ১৪ই জুন স্টকহোম শহরে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের যে সম্মেলন হয়েছিল—সেখানে ইন্দিরা গান্ধী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তার নির্বাচিত অংশ তুলে দেওয়া হলো।

"খুব ছোট বয়স থেকেই প্রকৃতিকে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। ফুল, পাখী—এরা ছিলো আমার সঙ্গী, বহু রাত আমার কেটেছে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে। পৃথিবীর রঙ রূপ গন্ধে আমি বিমোহিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের এই বসুন্ধরাকে আমি দেখতে চেয়েছি অন্য এক চোখে—মানুষের বাসভূমি হিসেবে।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বড় নিবিড়। আমাদের ভারতবর্ষের কথাই যদি ধরি, দেখবো সারা দেশে ছড়ানো আছে দু'হাজার বছর আগেকার এক আশ্চর্য মানুষের চিহ্ন

—যাঁর নাম সম্রাট অশোক। তিনি যে তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তাই নয়—অরণ্য এবং পশুপাখীদের নিরাপত্তার দিকেও ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। ইতিহাস খুঁজলে এমন আর একজন সম্রাটের নাম পাওয়া যাবে না যাঁর রাজত্বে প্রাণীহত্যা ছিল নিষিদ্ধ। অশোক বুঝতে পেরেছিলেন মানুষকে যদি প্রকৃত অর্থে শান্তি খুঁজতে হয়, তাহলে তা খুঁজতে হবে প্রকৃতির ভেতরই। অথচ আজ এটা গভীর পরিতাপের বিষয় যে আমরা অশোকের আদর্শকে ভুলতে বসেছি, নির্বিচারে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছি। বহু প্রজাতির প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেছে—মাইলের পর মাইল জুড়ে ইতিহাসের সমক্ষী যে সব বনানী ছিল তাদের আজ চিহ্নটুকুও নেই।.....

এখন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা মারা পড়েন না, বিষিয়ে দেওয়া হয় জল, মাটি, বাতাস ; এই বিষ থেকে রক্ষা পায় না অনাগত ভবিষ্যৎ মানুষও, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে বিশাল সংখ্যক জনগণ। অথচ দূষণ-সমস্যা দেশ-কাল-জাতির সীমারেখা মানে না, পরিবেশের ভারসাম্য আজ আমরা কি ভাবে বজায় রাখছি তার উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য।"

পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়

৩১ ডিসেম্বর '৮৪ দিল্লীর মাটিতে যে কলঙ্ক লেপন করা হল তা নতুন কিছু নয়। আজ থেকে ১২৪ বছর আগে খোদ আমেরিকাতেও খালিস্তান হতে চলেছিল।

কালো মানুষ নিয়ে দাস ব্যবসা ফলাও করে চালাবার জন্যে ১৮৫৪ সালে নতুন আইন আনা হয়। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন চাষীর ছেলে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা এব্রাহাম লিংকন। তখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর।

১৮৬৫ সনে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর ১৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে তিনি নাটক দেখতে গেছেন। মঞ্চ থেকে দক্ষিণী অভিনেতা মতান্ধ জন উইলকিস বুথ তাঁকে আকস্মিক গুলি করলো।

পরদিন ১৫ এপ্রিল মাত্র ৫৬ বছর বয়সে এই মহানায়কের সব শেষ। নিজের জীবন দিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ রোখার চেষ্টা করেছিলেন।

* *

৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ঃ প্রার্থনা করতে যাবার সময় ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আততায়ীর নাম নাথুরাম গডসে।

* * *

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ঃ জনসভায় ভাষণ দেবার সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান-কে গুলি করে হত্যা করা হয়।

কলম্বো, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ঃ শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েক-কে হত্যা করেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

* *

সান ক্রিস্তোবাল, ৩০ মে, ১৯৬১ঃ ডোমিনিক সাধারণ-তন্ত্রের একনায়ক র‍্যাফায়েল ট্রুজিলো-কে হত্যা করা হয়েছিল।

ডালাস, ২২ নভেম্বর ১৯৬৩ঃ জনসভায় ভাষণ দিয়ে ফেরার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন এফ, কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করা হয়! আততায়ীঃ লি হার্ভে অসওয়াল্ড।

মেমফিস শহরের লরেন মোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের সংগীতজ্ঞ বন্ধুকে যখন সবেমাত্র 'হে করুণাময় ভগবান—তুমি আমাদের হাত ধরো'—এই মুক্তি সংগীত গাইতে বলেছেন—ঠিক তখনই খুব কাছ থেকে আওয়াজ হল 'বুম বুম'।

সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

হারিয়ে গেলেন পৃথিবীর কালো ভাইদের মুক্তির দিশারী মার্টিন লুথার কিং।

সেদিন ছিল ৪ এপ্রিল, ১৯৬৮ ঃ মেমফিস শহরে সেদিন ঘাতক ছিল দাগী শ্বেতাঙ্গ জেল ফেরৎ জেমস আর্ল রে।

*

মানতিয়াগো, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ঃ জেনারেল অগুস্তো পিনোশে উগারতের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী চিলির জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে-কে হত্যা করে দেশে সামরিক শাসন জারি করে।

* * *

ঢাকা, ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ ঃ বাংলাদেশের এক সামরিক অভ্যুত্থানে সৈন্যরা রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমানের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে এবং তার পরিবারের অনেককে হত্যা করে।

* * *

কাবুল, ২৭ এপ্রিল ১৯৭৮ ঃ কর্নেল আব্দুল কাদের এর নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে পরিবারের আরও ৩০ জনের সঙ্গে নিহত হন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ দাউদ।

* * *

সিওল, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৯ ঃ এক রেস্তোরাঁর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি পার্ক চ্যাং হিকে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কিম জে কিউ।

* *

মনরোভিয়া, ১২ এপ্রিল ১৯৮০ ঃ সার্জেন্ট স্যামুয়েল ডো-র নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম টলবার্ট।

*

ঢাকা, ৩০ মে ১৯৮১ ঃ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

*

তেহরান, ৩০ আগস্ট ১৯৮১ ঃ বোমার আঘাতে হত্যা করা হয় ইরানের সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলি রজাই এবং প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ জাভেদ বাহনারকে।

* *

কায়রো, ৬ অক্টোবর ১৯৮১ ঃ সামরিক কুচকাওয়াজের সময় কয়েকজন সৈন্য মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে।

* * *

দিল্লী, ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ ঃ স্বগৃহ থেকে পাশে অফিস ঘরে যাওয়ার সময় বিয়ান্ত সিং ও সতবন্ত সিং নামে দুই নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে নিহত হন।

ঘটনাটা মোটামুটি এইরকম ঃ

এদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১নং সফদরজং রোডের বাসভবনে থেকে বেরিয়ে ১৪নং আকবর রোডের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়ে ১নং সফদরজং রোডের বাংলো ও ১৪নং আকবর রোডের বাংলো। বাসভবন থেকে বেরিয়ে শ্রীমতী গান্ধী সরকারি ভবনে পিটার উস্তিনভের ব্রিটিশ টেলিভিশন দলটিকে সাক্ষাৎকার দিতে

যাচ্ছিলেন। ঘড়িতে তখন প্রায় ন'টা দশ। আততায়ী দুই নিরাপত্তা রক্ষী বিয়ান্তসিং ও সতবন্ত সিং বাড়ির গাছপালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রধানমন্ত্রী বাসভবন থেকে বেরিয়ে তাদের কাছে আসতে তারা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নমস্কার করে। প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী গান্ধী হিন্দীতেই তাদের বললেন, নমস্তে। এর পর আচমকা বিয়ান্ত সিংই প্রথম তার রিভলভার থেকে প্রধানমন্ত্রীর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে। তারপর সতবন্ত সিং স্টেনগান চালায়। রক্তাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ইন্দিরার ব্যক্তিগত সহকারী ধাওয়ান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আহত ইন্দিরাকে অন্য নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় একটি অ্যামবাসাডার গাড়িতে তুলে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটুট অফ মেডিকেল সায়েন্সে নিয়ে যান। তখন সকাল ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিট। দশটা কুড়ি মিনিটে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইন্দিরার ব্যক্তিগত চিকিৎসক পি মাথুর, একজন স্নায়ু শল্যবিদ, চারজন শল্যবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ইন্দিরার জীবনরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতে থাকেন। হৃদপিন্ড ও ফুসফুস বাইপাস যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, অকসিজেন ও রক্ত দেওয়া চলতে থাকে। প্রায় কুড়িটি গুলিতে ঝাঁঝরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বেলা এগারোটার একটু পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য

- আরও বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান তথ্য, লেখা ও ছবি দেরিতে এসে পৌঁছনোয় এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলনা। অথচ সেগুলি না পড়লে এই সংখ্যার পূর্ণতা পাওয়া যাবে না। তাই সেইসব লেখা ও ছবি পক্ষিরাজের পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ '৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

- নানা পত্র পত্রিকা ও ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে বহু তথ্য ও ছবি সংগৃহীত হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক

ইন্দিরার ঠিকুজী

জন্ম—১৯ নভেম্বর ১৯১৭—এলাহাবাদ

৪১ ঘটি, ৫২ পল এবং ২৩ বিপল, রাত্রি প্রায় ১১ টায়।

(এলাহাবাদের সঙ্গে কলকাতার সময়ের পার্থক্য

প্রায় ২৬ মিনিট।)

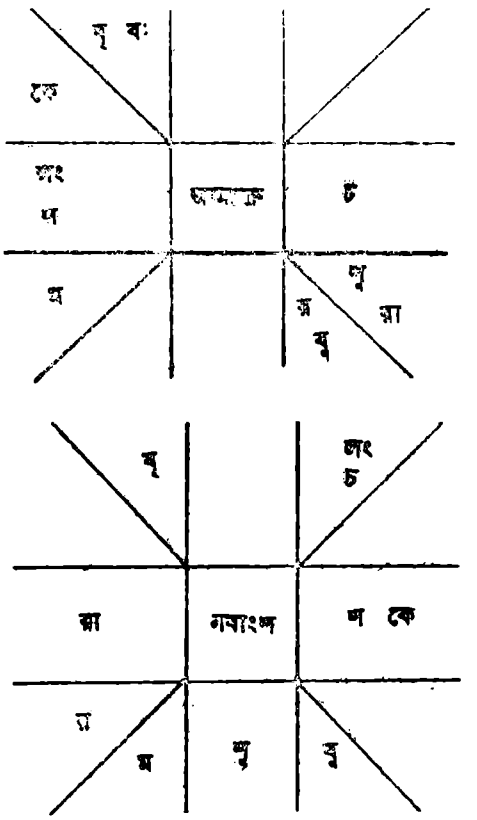

১৯৬৭ সালে বম্বের এক নামকরা জ্যোতিষ পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এক পলকে ইন্দিরা

ইন্দিরার জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর তাঁর জন্ম এমন একটি পরিবারে যাঁরা, সেই পরাধীনতার যুগেও পরিচিত ছিলেন দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে বিদেশে। পিতামহ মতিলাল, পিতা জওহরলাল ভারতীয় রাজনীতির আকাশে বিচরণ করেছেন প্রায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই। মাতা কমলা নেহরু বিরাজিত ছিলেন পিতা জওহরলালের পেছনে প্রেরণার মত। খুব স্বাভাবিক এই পরিবারের মেয়ে ইন্দিরা আপন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

ইন্দিরার কৈশোরে তাঁর অভিভাবকেরা ব্যস্ত ছিলেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনে। কারাগারের অন্তরালে কেটেছে তাঁদের দীর্ঘ দিন। শৈশব আর কৈশোরের অনেকগুলো দিনই প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার কেটেছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, এলাহাবাদের বাড়িতে। রাজনীতির স্ফুলিঙ্গ তখন থেকেই জ্বলছিল কিশোরী ইন্দিরার মনে। অভিভাবকেরা যখন ব্যস্ত সভায়, ইন্দিরা তখন বাড়ির ভৃত্যদের জড়ো করে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া রপ্ত করতেন।

ইন্দিরার স্কুল জীবন কেটেছে কখনও এখানে, কখনও ওখানে স্কুল জীবনের শুরু দিললিতে, কিছুদিন পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে এলাহাবাদে, তারপর সুইজারল্যানডে।

বারো বছর বয়সে ইন্দিরা ফিরে এলেন দেশের মাটিতে। বাবা মায়ের জনজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না রেখে তিনিও চাইলেন গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু বয়স বড় বাধা। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না তিনি। অবশ্য তাতে দমে থাকবার পাত্রীও তিনি নন, নিজের সমবয়সী বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে জুটিয়ে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'বানর সেনা' নামে এক বাহিনী। এই 'বাহিনী'র কাজ ছিল মুক্তি পথিকদের বার্তা বহন করে নিয়ে যাওয়া, সত্যাগ্রহীদের খাবার-জল দেওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা করা—অর্থাৎ যতটুকু তাদের সাধ্যে কুলোয়।

এরপর তিনি আবার পড়তে গেলেন স্কুলে, এবার পুণেতে। বোমবেতে ম্যাটরিকুলেশন পরীক্ষাও দিলেন। তারপর তাঁর জীবনে এল এক পরমক্ষণ, পিতা জওহরলাল তাঁকে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে, বিশ্বকবির পায়ের তলায়। পিতা জওহরলালের ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতী থেকেই ইন্দিরা যেন ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। ইন্দিরার পরবর্তী জীবনে কবির সান্নিধ্য, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সবই ফেলেছিল গভীর ছাপ। জন্ম দিয়েছিল সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, শিল্প সচেতনতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। জওহরলাল চেয়েছিলেন ইন্দিরার জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাব পড়ুক, তা মিথ্যে হয়নি কোনদিনও।

এর কিছুদিন পরেই ইন্দিরাকে আবার উড়ে যেতে হল সুইজারল্যানডে, সঙ্গে মা কমলা নেহরু। কারণ, মায়ের চিকিৎসা। ফলে শান্তিনিকেতনের পড়াশোনা অর্ধসমাপ্ত রইল। পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে লিখেছিলেন, ইন্দিরার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, আর দুঃখিত হয়েছেন ইন্দিরাকে হঠাৎ চলে যেতে হল দেখে।

১৯৩৬—মা কমলা নেহরু মারা গেলেন। ইন্দিরা অকসফোরডের সমারভিল কলেজে পড়তে গেলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জের-এ সেখানেও তাঁর লেখাপড়া অর্ধসমাপ্তই রইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাঁধল তখন ইন্দিরা সুইজারল্যানডের একটি স্যানিটোরিয়ামে। বাড়ির লোক তাঁকে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ জানাল। কোনক্রমে তিনি লনডনে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু আর এগোনো নয়। অগত্যা পুরো বিশ্বযুদ্ধের সময়টাই তাঁকে কাটাতে হয়েছিল লনডনে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, ইন্দিরা দেশে ফিরে এলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছাত্র আন্দোলনে। এরই মধ্যে ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ১৯৪২ সালে বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। এবং বৃটিশ রাজের হাতে ইন্দিরা হলেন বন্দিনী। তের মাস তাঁকে কাটাতে হল কারাগারের অন্তরালে।

১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদটি অলংকৃত করলেন জওহরলাল। কন্যা ইন্দিরা জওহরলালের সংসার সামলানর দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন না বাইরের জগৎ থেকে। এমনকি জওহরলালের কাছে যেসব সাক্ষাৎপ্রার্থী আসতেন অনেক সময় তাঁদের সঙ্গে ইন্দিরা নিজেই কথাবার্তা বলতেন। দিনে দিনে পরিণত হয়ে উঠতে লাগলেন ইন্দিরা।

ইন্দিরা যে নিজের জোরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আজ সর্বত্র। তাই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল মাদারস অ্যাওয়ারড (১৯৫৩), ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হওলান পুরস্কার (১৯৬০), আন্তর্জাতিক

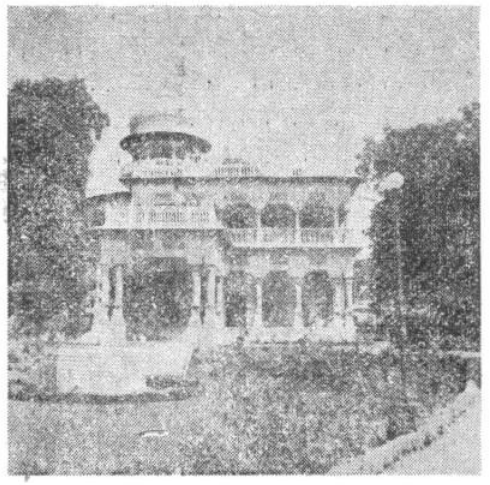

আনন্দভবন, এলাহাবাদ

"..কত বই আমাদের আনন্দভবনে। প্রচুর বই পড়েছি। ভাল লাগত ভারতের উপকথা, রামায়ণ, মহাভারত একটু বড় হয়ে গ্যারিবল্ডি, সাইমন বলিভার, জোন অফ আর্কের জীবনী, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর লেখা বই পড়তে নিষেধ করতেন বাবা। বাবার ভয়ে বাথরুমে লুকিয়ে বই পড়েছি।" — **ইন্দিরা**

সমঝোতার জন্য ইসাবেলা ডোসটে পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য মেকসিকান অ্যাকাডেমির পুরস্কার (১৯৭২), রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যানড এগরিকালচার অরগানাইজেশন-এর দ্বিতীয় বাৎসরিক পুরস্কার (১৯৭৩) । লাভ করেছিলেন 'ভারতরত্ন' উপাধি। অর্জন করেছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ার পারসন হবার সৌভাগ্য। এমনকি এবছর তাঁর নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও প্রস্তাবিত হয়েছিল।

১৯৫৫ সাল থেকে ইন্দিরা কংগ্রেস হাইকম্যানড এবং নির্বাচনী কমিটির সদস্যা ছিলেন। ১৯৫৬-য় তিনি যুব কংগ্রেস সভাপতির পদে বসলেন। ১৯৫৯-এ হলেন কংগ্রেস সভাপতি। এই পদটি এর আগে তাঁর পিতামহ মতিলাল এবং পিতা জওহরলালও অলংকৃত করে গেছেন।

১৯৬৪-তে তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করলেন। ঐ বছরই পিতা জওহরলাল মারা গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ইন্দিরার জায়গা হল। প্রথমে তাঁকে বিদেশ দফতরের ভার দিতে চাওয়া হলে তিনি তা না নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকেই বেছে নেন!

১৯৬৬তে লালবাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা মোরারজী দেশাই-এর বিরুদ্ধে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দাবিদার করে তুললেন কিছু কংগ্রেসী নেতা। মোরারজীর পাওয়া ১৬৯ ভোটের বিরুদ্ধে ৩৬৫ ভোট পেয়ে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। অল্প দিনে ইন্দিরাই হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দী নেত্রী।

১৯৬৭-৭৭, টানা এগার বছর প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বাদ লাভ করে গেলেন তিনি। মাঝখানে অবশ্য অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়েছে তাঁকে। জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্তাল আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, পুত্র সঞ্জয়কে রাজনীতিতে আনার জন্য কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে, আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী করতে হয়েছে।

এল ১৯৭৭ সাল। লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা পরাস্ত হলেন। কংগ্রেসের ভরাডুবি হল। একদাবন্ধুরা ইন্দিরাকে ছেড়ে গেলেন। ক্ষমতায় বসল জনতা দল। আদালতে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন ইন্দিরা। তাঁকে পাঠান হল তিহার জেলেও।

কিন্তু আবার ইন্দিরা প্রমাণ করলেন রাজনৈতিক ক্ষুরবুদ্ধিতে তাঁর ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে পারেন না। ১৯৮০-র নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলেন, কংগ্রেসকে করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। সুখের পায়রারা আবার উড়ে এল তাঁর কাছে। ঐ ১৯৮০তেই আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল তাঁর জীবনে। বিমান দুর্ঘটনায় পুত্র সঞ্জয়ের মৃত্যু হল।

ক্ষমতায় এসে এবারও ইন্দিরাকে সামাল দিতে হয়েছে অনেক দিক। পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা সামলাতে হয়েছে। বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে হয়েছে। বিদেশি হুমকির প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছে! অবশ্য এরই মধ্যে তাঁর আরেক পুত্র রাজীবও রাজনীতিতে পোক্ত হয়ে গেছেন।

আর তারপর এই ১৯৮৪। লোকসভা নির্বাচন যখন প্রায় ভারতীয় রাজনীতির দরজায় ঠিক সেই সময়ই চক্রান্তকারীদের ঘৃণ্য চক্রান্ত ছিনিয়ে নিল ভারতীয় রাজনীতির এক কিংবদন্তীর চরিত্র ইন্দিরা গান্ধীকে।

PRIME MINISTER
INDIA

MESSAGE

The writings of some of our most eminent thinkers and authors in Bengali have enriched it and made it one of the important languages of the world.

My good wishes for the special Baisakh issue of Pakshiraj.

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

New Delhi
March 19, 1983

পক্ষিরাজকে পাঠানো তাঁর শেষ শুভেচ্ছাপত্র

স্মৃতিরেখা

পরিচয় গুপ্ত

কেউ বলতেন ইন্দিরাজী
কেউ বলতেন ইন্দু
রক্তে-রাঙা দেশের মাটি
পাহাড় ভস্ম-বিন্দু।
হত্যাকারী সিং
কি করেছে আজও জানে না।
নিরেট, হৃদয়হীন।
পাহাড়-গঙ্গা-মাটি
জ্বালিয়ে স্মৃতির বাতি
মা রইলেন বিরাজিতা
চলল রাজীব—হাঁটি।

ভালোবাসতেন বাংলা ভাষাকে

শান্তিনিকেতনে পড়বার সময়ে ইন্দিরা ভালোই বাংলা শিখেছিলেন। এবং সহপাঠীদের সঙ্গে বাংলায় কথাও বলতেন। পরে চর্চার অভাবে বাংলায় কথা বলার সে অবারিত ক্ষমতা তাঁর ছিল না! কিন্তু কেউ বললে তিনি বুঝতে পারতেন।

একবার তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে, বাংলায় কথা বলার সুযোগ তিনি পাননা। কারণ বাঙ্গালীরা তার সঙ্গে বাংলার পরিবর্তে ইংরাজীতে কথা বলেন। বাংলায় বললে তিনি নিশ্চয় বাংলায় উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য তিনি পেয়েছিলেন। তাই গুরুদেবের ভাষাকে তিনি মাতৃভাষার মতোই ভালোবাসতেন।

নানা ইন্দিরা

একটি সাংবাদিক বৈঠক সেরে ইন্দিরা গান্ধী উঠে দাঁড়ালেন। সাংবাদিকরা তখনও তাঁকে ঘিরে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি আর কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এগিয়ে চললেন অপেক্ষমান গাড়ির দিকে। দরজা পেরোতেই তাঁর স্বগত উক্তি, কী সুন্দর বাগিচা! কলকাতা প্রেস ক্লাবের লন দেখে মুগ্ধ ইন্দিরা। আবার সোচ্চার ঃ দোলনা ভি হ্যায়! আমি দোলনা চড়তে খুব ভালবাসি।

ঃ দোলনা চড়বেন একবার? চলুন না। এই অনুরোধের জন্যই তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন। এগিয়ে চললেন দোলনার দিকে। তারপর দোলনায় চেপে বসলেন। বললেন, ডোনট পুশ মি। আই মিসেলফ উইল রাইড কথা শেষের আগেই দোলা শুরু হল।

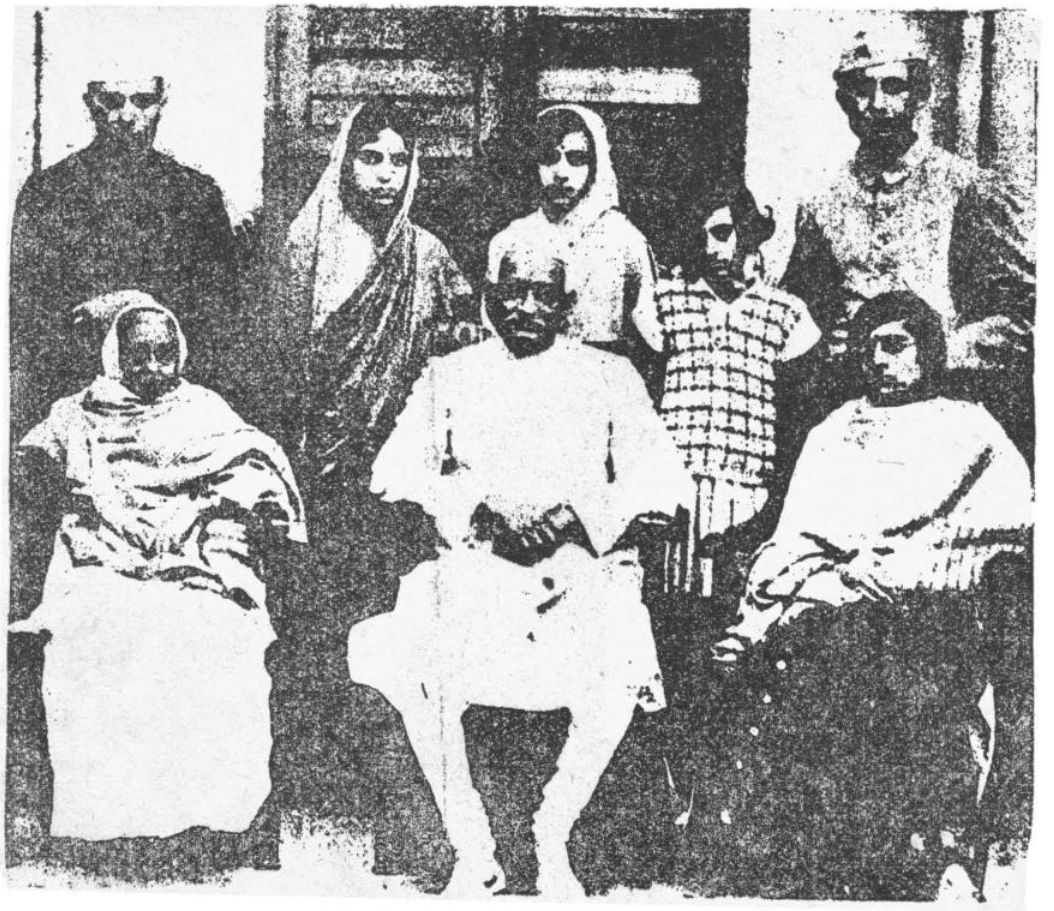

নেহরু পরিবার। পেছনে দাড়িয়ে ছোট্ট ইন্দু

দোলনায় দুলতে দুলতে তিনি আবার সরব ঃ আমাকে কি স্কুলের ছাত্রী মনে করছ ?

* * *

১৯৭৮ সাল। নদীয়ায় চাপড়ায় সেবার আচমকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। খবর পেঁছুল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও। তিনি বিশেষ বিমানে দিল্লি থেকে পাড়ি দিলেন সকাল ন'টার আগেই তিনি দমদম বিমানবন্দরে নামলেন। পথে ভীড়, শ্লোগান আর প্রায় প্রতি মোড়েই পথসভা। প্রায় প্রতিটি সভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ। এমনি একটানা অঘোষিত অনুষ্ঠান সেরে যখন চাপড়ায় পেঁছুলেন, তখন বেলা দুটো। অজ পাড়াগাঁ। গ্রামের সীমানায় গাড়ি যাওয়া অসম্ভব। লাফিয়ে নেমে পড়লেন শ্রীমতী গান্ধী। তারপর গ্রামের ভেতরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আশ্বাস। রেবেকা বিবি শ্রীমতী গান্ধীর হাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ইন্দিরাকে মা বলে সম্বোধন করতে ইন্দিরার চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত। চোখের জল মুছে ইন্দিরা রেবেকাকে সান্তনার সুরে বললেন, মায়ের কথা মনে রাখবে। বিপদে ধৈর্য হারাবে না। বেলা তখন প্রায় ৫টা। চাপড়া থেকে ফিরে কৃষ্ণনগর সারকিট হাউসে। সেখানে তাঁর খাবারের সব আয়োজনই ছিল। কিন্তু তিনি এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। বললেন, মন এবং শরীর ভাল নেই। শরীর ভাল নয় শুনে সকলে চিন্তিত। শ্রীমতী গান্ধী হাত বাড়িয়ে দিলে দেখা গেল তাঁর উত্তাপ খুব বেশি—ইনফ্লুয়েনজায় তিনি আক্রান্ত।

আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়
এই কথা বলে
যাব আমি চলে...

দশচক্রে ভগবান ভূত!

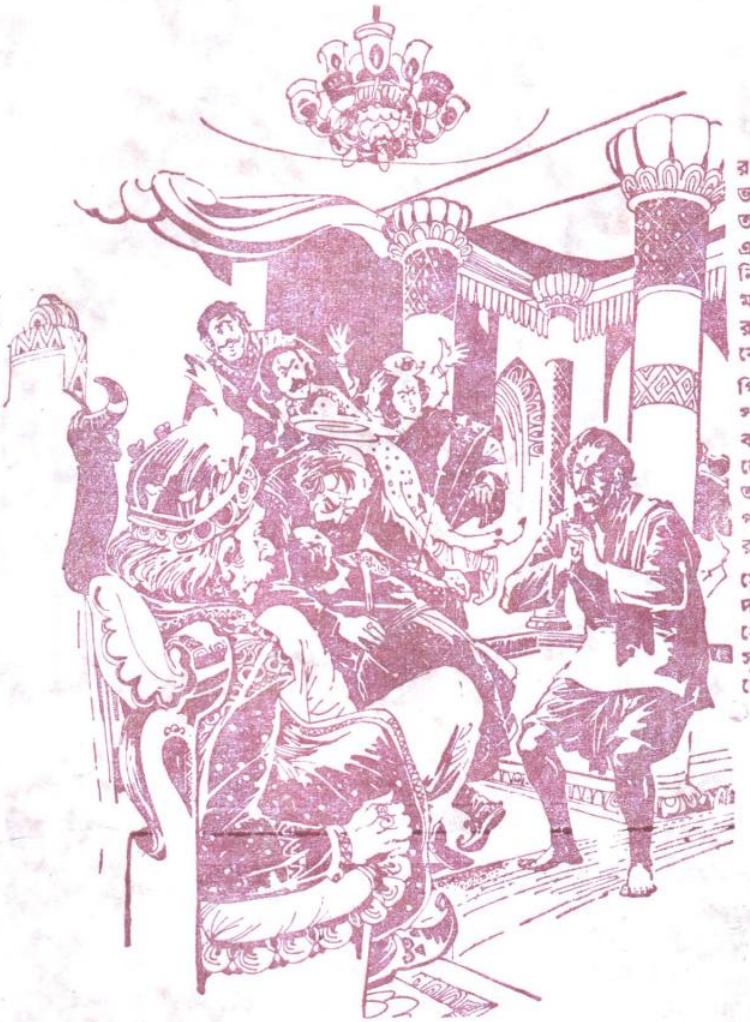

রাজা সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন ভগবান নামে বয়সাকে। সবাই তাই ভগবানকে হিংসে করত। একদিন ভগবান রাজসভায় আসে নি। তারা রটিয়ে দিল ভগবান মারা গেছে। পরদিন ভগবান রাজসভায় এলে সভাসদরা রাজাকে বোঝাল—এ ভগবানের ভূত।

পিয়ারলেসের অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত স্বার্থান্বেষীরা অনেক ভুল প্রচার করছেন, তাদের কথায় কান দিলে লোকসান আপনারই। কেননা আপনার কাছে দায়ের পাই পয়সাটি পর্যন্ত পিয়ারলেস গচ্ছিত রেখেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে।

সে টাকা কেবলমাত্র আপনার দাবী দাওয়া মেটানো ছাড়া অন্য কোন কারণেই তোলা যাবে না। সুরক্ষার এমন নজির আর কোথায় আছে?

ভারতের বৃহত্তম নন ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : "পিয়ারলেস ভবন" ৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯

(স্থাপিত ১৯৩২)

Indira Smarane Pakshiraj
R. N. No. 32844/78
Reg. No. WB/EC 165
Re. 1/=